POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

অনুবাদ: হে ঈমান আনয়নকারীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করবে তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখবে। আর কোনো লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব সে যেন লিখে। আর যার উপর অপরের অধিকার রয়েছে, সে যেন লিখিয়ে নেয় এবং আল্লাহকে, তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তা থেকে কিছুই কম না করে। অতঃপর যার উপর অপরের অধিকার রয়েছে যদি সে নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লিখিয়ে নিতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী করো। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী-এমন সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করো। এটা এ জন্য যে, যদি তাদের একজন ভুলে যায় তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আর যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। আর ঋণ ছোট হোক বা বড়, তার নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তা লিখতে অলসতা করো না। এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অধিক দৃঢ় এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি তা নগদ ব্যবসা হয়, যা তোমরা নিজেদের মধ্যে হাতবদল করে থাকো, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই। আর যখন তোমরা কোনো (দীর্ঘমেয়াদি) ক্রয়-বিক্রয় করো তখন সাক্ষী রাখবে। আর লেখক ও সাক্ষীকে কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর যদি তোমরা তা কর, তবে নিশ্চয়ই তা তোমাদের জন্য গুরুতর পাপের বিষয় হবে। আর আল্লাহকে ভয় করো, আর আল্লাহই তোমাদের শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 21

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 21 May 2026 3 জুল হজ্জা 1447 A.H

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঋণ পরিশোধের দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী গঁযধসসধফ-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। সে নিজের ঋণ পরিশোধের দাবি করল এবং খুবই অশোভন আচরণ করল। এতে সাহাবিগণ (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তাকে ধমক দিতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে কিছু বলো না; কারণ যার পাওনা আছে, তার কিছু বলার অধিকারও আছে। এরপর তিনি বললেন, তাকে সেই বয়সের একটি উট দাও, যে বয়সের উট তার পাওনা। সাহাবিগণ (রা.) আরজ করলেন, বর্তমানে তো এর চেয়ে বেশি বয়সের একটি উটই রয়েছে। তখন তিনি বললেন, সেটিই তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে নিজের ঋণ সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দরভাবে পরিশোধ করে।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে এক মুকাতাব গোলাম এলো এবং বলল, আমি মুক্তিপণ পরিশোধ করতে অক্ষম। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না, যা আমাকে মহানবী মহম্মদ (সা.) শিখিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, যদি তোমার উপর পাহাড়সম ঋণও থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা এই দোয়ার বরকতে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমরা এই দোয়া পড়বে-

"হে আমার আল্লাহ! তোমার দেওয়া হালাল রিযিকই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, যাতে হারাম রিযিকের প্রয়োজন না পড়ে। তুমি আমাকে হালাল রিযিক দাও, হারাম থেকে রক্ষা করো এবং তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য সকলের মুখাপেক্ষিতা থেকে আমাকে মুক্ত ও অমুখাপেক্ষী করে দাও।"

(সূত্র: হাদীকাতুস সালেহীন, হাদিস নম্বর ৮৩২ ও ৮৩৫)

মানুষের উচিত জীবন যাপনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই মিতব্যয়িতাকে সামনে রাখা, যাতে কখনো সুদভিত্তিক ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য অদৃশ্য থেকে কোনো না কোনো উপায় সৃষ্টি করে দেন। আফসোস, মানুষ এই রহস্যটি বোঝে না যে, মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না, যাতে সে সুদভিত্তিক ঋণ নিতে বাধ্য হয়। মনে রাখবে, যেমন অন্য গুনাহ রয়েছে-যেমন ব্যভিচার ও চুরি-তেমনি সুদ দেওয়া এবং নেওয়াও একটি গুনাহ। কতই না ক্ষতিকর এই বিষয়! সম্পদও গেল, মর্যাদাও গেল, আর ঈমানও চলে গেল।

সাধারণ জীবনে এমন কোনো বিষয়ই নেই, যার জন্য এত ব্যয় প্রয়োজন হয় যে মানুষ সুদভিত্তিক ঋণ নিতে বাধ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের ক্ষেত্রেই দেখো-এতে তো কোনো খরচ নেই। উভয় পক্ষ সম্মতি দিল আর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর ওয়ালীমা করা সুন্নত। সুতরাং যদি কারো সেই সামর্থ্যও না থাকে, তবে সেটিও মাফ। মানুষ যদি মিতব্যয়িতা ও সাশ্রয়ী জীবনযাপন করে, তবে তার কোনো ক্ষতিই হয় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মানুষ নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা ও সাময়িক আনন্দের জন্য আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

দেখো, সুদের গুনাহ কতই না ভয়াবহ! এরা কি জানে না যে, শূকরের মাংস খাওয়াও চরম বাধ্যবাধকতার অবস্থায় বৈধ করা হয়েছে? যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

"অতঃপর যে ব্যক্তি বাধ্য হয়, অথচ সে অবাধ্য নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নয়, তার উপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কিন্তু সুদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেননি যে, বাধ্য অবস্থায় তা বৈধ। বরং এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"

যদি তোমরা সুদের লেনদেন থেকে বিরত না হও, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা।

আমাদের বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে, তার এমন প্রয়োজনই পড়ে না। মুসলমানরা যদি এই বিপদে পতিত হয়ে থাকে, তবে তা তাদের নিজেদেরই বদআমলের ফল। হিন্দুরা যদি এই গুনাহ করে, তবে তারা ধনী হয়ে যায়; কিন্তু মুসলমানরা এই গুনাহ করলে ধ্বংস হয়ে যায়-"দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারালো-এর বাস্তব চিত্রে পরিণত হয়। তাহলে কি মুসলমানদের জন্য এ থেকে বিরত থাকা জরুরি নয়?

মানুষের উচিত জীবন যাপনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই মিতব্যয়িতাকে সামনে রাখা, যাতে কখনো সুদভিত্তিক ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। কারণ সুদ এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, একসময় তা আসল অর্থের চেয়েও বেশি হয়ে যায়। গতকালই একজনের চিঠি এসেছিল যে, সে এক হাজার রুপি পরিশোধ করেছে, তবুও আরও পাঁচ-ছয়শ' রুপি বাকি রয়েছে। এরপর আরেকটি বিপদ হলো-আদালতও এ ধরনের বিষয়ে ডিক্রি জারি করে দেয়। কিন্তু এতে আদালতেরই বা কী দোষ? যখন লিখিত স্বীকারোক্তি রয়েছে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে সুদ দিতে রাজি হয়েছে। ফলে আদালত সেই অনুযায়ী ডিক্রি জারি করে।

এর চেয়ে উত্তম হতো যদি মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো তহবিল গঠন করত এবং তা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করত, যাতে কোনো ভাইকে সুদে ঋণ নিতে না হতো। বরং সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিত এবং নির্ধারিত সময়ে তা ফেরত দিয়ে দিত। (বদর, খণ্ড ৭, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, পৃষ্ঠা ৬)(তাফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮৯-৩৯০ অবলম্বনে)

নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করো না। যখনই তোমরা ঋণ দেবে বা নেবে, লেনদেনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করো।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বাকারার ২৮৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা গণ-বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ হিসেবে সুদকে উল্লেখ করেছেন। এখন জাতীয় অধঃপতনের আরেকটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, লেনদেনের ব্যাপারে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে না। ঋণ দেওয়ার সময় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার কারণে না ফেরতের কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়, আর না তা লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়। পরে যখন টাকা ফেরত আসতে দেখা যায় না, তখন ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। এমনকি বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়ায়, এবং সমস্ত বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করো না। যখনই তোমরা ঋণ দেবে বা নেবে, তখন আমার এই দুটি নির্দেশ স্মরণে রেখো। প্রথমত, ঋণ নেওয়ার সময় পরিশোধের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে নাও। দ্বিতীয়ত, লেনদেনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করো।

এই শর্তের একটি বড় উপকার হলো, ঋণগ্রহীতা সর্বদা সচেতন থাকে যে, অমুক সময়ের পূর্বে তাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ফলে সে তা পরিশোধের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আরেকটি উপকার হলো, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকে এবং তার এই আশঙ্কা থাকে না যে, ঋণদাতা হঠাৎ কখন টাকা দাবি করে বসবে। মোটকথা, এতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা-উভয়েরই উপকার রয়েছে। ঋণদাতার উপকার হলো, উদাহরণস্বরূপ যদি এক মাস পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে, তবে সে এক মাস পরেই টাকা চাইবে। তাকে প্রতিদিন জিজ্ঞেস করতে হবে না।

(এরপর ৮ পাতায়....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

দোয়া এবং যিকরে ইলাহি–
ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য মহান অস্ত্র

মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এই কথা বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হবে পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল দলিল, দোয়া এবং আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে। আর এই উদ্দেশ্যেই হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সমগ্র জীবনে দোয়া ও যিকরে ইলাহীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহী সম্পর্কে এমন এক আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার রেখে গেছেন, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর পরে খোলাফায়ে আহমদিয়্যাত সময়ে সময়ে দোয়া ও যিকরে ইলাহীর ব্যাপক বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছেন, যাতে পৃথিবীব্যাপী জামা'আতসমূহ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে। দোয়া ও যিকরে ইলাহীর ফলস্বরূপ গত সোয়া একশ' বছরে জামা'আত এমনসব বরকত লাভ করেছে, যার হিসাব করা যায় না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯১৬ সালে এক ব্যাপক ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যা যিকরে ইলাহী ও দোয়ার গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এই গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা আকাশ ও পৃথিবীর মহান সৃষ্টি অবলোকন করতে করতে দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বে শয়নরত অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। (আলে ইমরান ৩:১৯২)

অতঃপর তিনি বলেন যে, যখনই তাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়, তখন তারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে।

তিনি বলেন, যদি তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে বসে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তবে তারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

(আলে ইমরান ৩:১৩৭)

পুনরায় তিনি বলেন যে, আল্লাহর নেক বান্দারা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ দেখে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে। (আল-বাকারাহ ২:২৩২)

আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বান্দারা যদি তাঁকে স্মরণ করে এবং মনে রাখে, তবে আল্লাহও তাদের স্মরণ করবেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে তোমাদের বিপদ ও পরীক্ষার সময় স্মরণ করব।" আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের সম্পর্কে বলেন:

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, শয়তানের পক্ষ থেকে যখন কোনো কুমন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করে, তখন তারা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।"

(আল-আ'রাফ ৭:২০২)

আর যারা আল্লাহর যিকর করে না এবং গাফেল থাকে, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন: "ধ্বংস তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকর থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে কঠোর হয়ে গেছে।" (আয-যুমার ৩৯:২৩)

আর হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আমরা তাকে এমন অবাধ্য সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলব, যারা হবে ধর্মহীন। তাদের ঝোঁক কেবল দুনিয়ার দিকে থাকবে এবং তারা ইবাদতে ইলাহী থেকে গাফেল থাকবে।"

(তাযকিরাহ, পৃ. ৩৮২)

মহানবী (সা.) যিকরে ইলাহীকে জান্নাতের বাগানের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে এবং যে করে না, তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। তিনি আরও বলেছেন যে, যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয়, তা আবাদ থাকে, আর যেসব ঘর যিকরে ইলাহী থেকে বঞ্চিত থাকে, সেখানে বিরানতা নেমে আসে। এ কারণেই তিনি শুধু মসজিদে নয়, ঘরেও নামায পড়ার প্রতি জোর দিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, যুগের খোলাফাগণ শুরু থেকেই আহমদীদেরকে সময়ে সময়ে যিকরে ইলাহীর প্রতি মনোযোগী করে আসছেন। বরং তারা জামা'আতের সামনে যিকরে ইলাহীর ব্যাপক কর্মসূচি পেশ করে আসছেন। আর আহমদিয়্যাতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে জামা'আত মন্দ কাজ থেকে বিরত থেকেছে এবং নেকী ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিরোধিতার পাহাড়সমূহ এই দোয়ার মাধ্যমেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এবং জামা'আত বিশ্বব্যাপী উন্নতি লাভ করেছে।

প্রকৃত যিকর হলো নামায, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম করো।"(ত্বা-হা ২০:১৫)

আর আল্লাহ পবিত্র কুরআনকেও "যিকর" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"নিশ্চয় আমরাই এই যিকর অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক।"

(আল-হিজর ১৫:১০)

তবে পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নেক বান্দারা দাঁড়িয়ে, বসে, ঘুমিয়ে, জেগে এবং প্রত্যেক কাজের মধ্যেই আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। আনহযরত (সা.) বলেছেন:

"সর্বোত্তম যিকর হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।"

অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব এবং কেবল তিনিই উপাসনার যোগ্য-এই স্বীকারোক্তিই সর্বোত্তম যিকর।

তাসবীহ ও তাহমীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এ দুটি বাক্য জিহ্বার উপর হালকা হলেও আল্লাহর পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। তা হলো:

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।"

অনুরূপভাবে দরূদ শরীফ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এটি দোয়া ও যিকরে ইলাহীর কবুল হওয়ার একটি মাধ্যম।

এ কারণেই হযরত আমীরুল মুমিনীন (আই.) আমাদের আহমদীদেরকে নিম্নোক্ত দোয়াসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা জামা'আতের সদস্যদের স্মরণার্থে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আলোচনার শেষে হযরত মসলে মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থ "যিকরে ইলাহী"থেকে যিকরে ইলাহীর উপকারিতার একটি সারসংক্ষেপ তাঁরই মুবারক লেখনী থেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এই আশায় যে আল্লাহ তাআলা আমাদের আহমদীদেরকে আমাদের প্রিয় ইমামের যিকরে ইলাহী সম্পর্কিত এই মুবারক তাহরীকের উপর নিয়মিত আমল করার তাওফীক দান করুন।

হযরত মসলে মওউদ (আ.) বলেন:

"এখন আমি যিকরে ইলাহীর কিছু উপকারিতা বর্ণনা করছি।

যিকরের মাধ্যমে যে সর্ববৃহৎ উপকার লাভ হয় তা হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় উপকার হলো, হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হয়।

তৃতীয় উপকার হলো, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন।

চতুর্থ উপকার হলো, যিকরকারী ব্যক্তি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

পঞ্চম উপকার হলো, হৃদয় দৃঢ় হয়।

ষষ্ঠ উপকার হলো, যিকরকারী ব্যক্তি প্রত্যেক উদ্দেশ্যে সফল হয়, যদি সে আন্তরিকতার সাথে যিকর করে।

সপ্তম উপকার হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার ছায়া তার উপর থাকবে।

অষ্টম উপকার হলো, দোয়া কবুল হয়।

নবম উপকার হলো, গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

দশম উপকার হলো, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। একাদশ উপকার হলো, তাকওয়া সৃষ্টি হয়। দ্বাদশ উপকার হলো, আল্লাহর প্রেম বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরও বলেন:

"এগুলো হলো যিকরুল্লাহর উপকারিতা, যা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। আর আমি দোয়া করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এবং আমাকেও এগুলো থেকে উপকৃত করুন।" (আমীন)

(সূত্র: আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ৩, সারসংক্ষেপ, পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৮)

****

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরূদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

জুমআর খুতবা

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'মনে রেখো! নিশ্চয় সত্য তাওহীদ কেবল নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। যেমনটি আমাদের নবী (সা.) আরবের নাস্তিক ও ধর্মহীনদের হাজার হাজার আসমানী নিদর্শন দেখিয়ে খোদার অস্তিত্বের দিকে নিয়ে এসেছেন। আজও নবী করীম (সা.)-এর সত্য ও পূর্ণ অনুসারীরা সেই নিদর্শনগুলো নাস্তিকদের সামনে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে। এটাই বাস্তবতা যে, যতক্ষণ পর্য ন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি প্রত্যক্ষ না করে, ততক্ষণ শয়তান তার অন্তর থেকে বের হয় না। আর না তার অন্তরে সত্য তাওহীদ প্রবেশ করে, আর না সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বের বিশ্বাসী হতে পারে। আর এই পবিত্র ও পূর্ণ তাওহীদ কেবল তাঁর (সা.)-এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়।'

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

মহানবী (সা.) বারবার এটিই বলছিলেন। যেন তাঁর জাতির জন্য শেষ অবস্থায় এবং শেষ শিক্ষা হিসেবে তিনি এটিই দিয়েছেন যে, আমাকে কোনো অংশীদারত্বপূর্ণ মর্যাদা দিও না এবং যদি তোমরা তা করো, তবে এটা মনে করো না যে আমি এতে সন্তুষ্ট হব; বরং আমার আত্মা এমন মানুষদের ওপর অভিশাপ দেবে, যারা এমন কাজ করবে।

মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থাকে দেখে জানা যায় যে, তাঁর (সা.) এবং সকল নবীদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল শিরক দূর করা এবং আল্লাহ তা'লাকে মানানো, তাঁর একত্বকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া।

অতএব আমরা যারা তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের অনুসারী, আমাদের উচিত এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা যে, আমরা তাওহীদের প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি সৃষ্টি করে মহানবী (সা.)-এর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বেদনা ছিল তা বুঝে, তার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে প্রকৃত একত্ববাদী হয়ে উঠি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

যুদ্ধের পরিস্থিতিও ক্রমাগত সবচেয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং ইসরায়েল এই প্রচেষ্টায় রয়েছে যে, তাদের প্রাধান্য পুরো পৃথিবীতে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় প্রথম আক্রমণের সময় বলেছিল যে, এখন এই অঞ্চলের, বরং আরব দেশগুলোরও মানচিত্র পরিবর্তন করা হবে।

শত্রু এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায়, যাতে মুসলিম দেশগুলো কখনো একে অপরের সাহায্যকারী হতে না পারে। অতএব অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এ দিক থেকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং ইসলামী দেশগুলোকে ঐক্যের মালায় গাঁথারও তৌফিক দান করুন। আমীন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭ শে মার্চ , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৭ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী বা সীরাত প্রসঙ্গে তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদের আলোচনা চলছিল। মক্কা বিজয়ের সময় মূর্তি ভাঙার বিস্তারিত বিবরণ বিগত খুতবাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সবকিছুই তিনি (সা.) আল্লাহ তা'লার তওহীদের ঘোষণার অংশ হিসেবে করেছিলেন, যেন এটি বোঝানো যায় যে, তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করো, তাদের পরিণতি হলো এই। অতএব আমরা দেখেছি, মক্কার আশেপাশে মুশরিকদের বড় বড় মূর্তি, যেমন- মানাত, উযযা, সুওয়া ইত্যাদিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তায়েফবাসীদের মূর্তি 'লাত' সম্পর্কে একটি বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মর্যাদাবোধ এই আপস মেনে নেয়নি। তায়েফবাসী পুনরায় নিবেদন করে যে, অন্তত এক বছরের জন্য যেন তা না ভাঙা হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) তারপরও অস্বীকার করেন। তারা বলল, ঠিক আছে, অন্তত এক মাসের জন্য এটি না ভাঙার অনুমতি দিন, যেন লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করে এবং বোকা লোক ও নারীরা এটি ভাঙার কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে না যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) এরও অনুমতি দেননি এবং হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ও হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে পাঠিয়ে সেই মূর্তিটি ভেঙে ফেলেন। তওহীদের প্রতি তাঁর (সা.) মর্যাদাবোধ এটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি যে, এই মূর্তিগুলোকে কোনো অবস্থাতেই অবশিষ্ট রাখা হবে, বিশেষ করে যখন কিনা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

আবুল হাইয়্যাজ আসাদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) আমাকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজে অর্থাৎ সেই অভিযানে পাঠাব না, যে অভিযানে রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো, তুমি কোনো মূর্তি ছাড়বে না, বরং তা ধ্বংস করে দেবে এবং কোনো উঁচু কবর ছাড়বে না, বরং তা সমান করে দেবে।

[সহীহ মুসলিম, (অনুবাদ) ৪র্থ খণ্ড, পৃ : ১৩৩]

কেন? কারণ এগুলো তওহীদকে অস্বীকারকারী বিষয় এবং ইসলামী শাসনে একে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল মুসলমানদের একটি বিশাল অংশ কবর পূজা করে, সেজদা করে এবং খোদা তা'লার কাছে চাওয়ার পরিবর্তে ওইসব কবরে শায়িত বুযুর্গদের কাছে চায় এবং এ বিষয়ে তারা চরম বাড়াবাড়ি করে থাকে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.) তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কার মুশরিকদের মতো একটি শক্তিশালী জাতির মোকাবিলা করেছিলেন এবং পরিশেষে পবিত্র কাবাঘরকে তিনশত ষাটটি মূর্তি থেকে পবিত্র করেছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি, তিনি (সা.) ইসলাম গ্রহণকারীদের হৃদয়েও তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান ও বরকতময় জিহাদ করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র শক্তির বদৌলতে তওহীদকে ভালোবাসে এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) এত সূক্ষ্ম ও চমৎকার উপায়ে তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, শিরকের সামান্যতম ধারণাও কারও চিন্তায় উদয় হতে পারত না। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি সাহাবীদের (রা.) এ বিষয়েও বারণ করেছিলেন যে, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর (রা.)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা ইবনে

মরিয়মের/মরিয়ম পুত্রের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর বান্দা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (সহীহ বুখারী, কিতাব-আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৪৪৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি একটি কাফেলার সাথে যাচ্ছিলেন এবং নিজ পিতার নামে শপথ করছিলেন।

তিনি (সা.) বলেন, শোনো! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজেদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে বারণ করেছেন। যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে। (সহীহ বখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৬৬৪৬)

আল্লাহ তা'লার তওহীদের বিপরীতে সামান্যতম কোনো কিছুকে দাঁড় করানো হোক, এটি তাঁর (সা.) কাছে অসহনীয় ছিল।

তওহীদের কলেমা পাঠকারীর মর্যাদা সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার বর্ণনা করেন, হযরত মিকদাদ বিন আমর কিনদী (রা.), যিনি বনু যুহরার মিত্র ছিলেন এবং সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন- তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেছিলেন, "আমাকে বলুন, যদি কাফেরদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির সাথে আমার মোকাবিলা হয় এবং আমরা উভয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ি, আর সে আমার দুই হাতের মধ্যে এক হাতে তরবারির আঘাত করে তা কেটে ফেলে; এরপর আমার থেকে একটি গাছের আড়ালে চলে যায়, অর্থাৎ লুকিয়ে পড়ে এবং বলে যে, 'আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করছি'। হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এখন কি আমি তাকে হত্যা করে ফেলব, যখন কিনা সে এ কথা বলে দিয়েছে, অর্থাৎ কলেমা পড়ে নিয়েছে, তার এমন কথা বলার পরও?" রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তুমি তাকে হত্যা করো না।" হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, "হে আল্লাহর রসূল (সা.)! সে আমার এক হাত কেটে ফেলেছে এবং তা কাটার পর তারপর এ কথা বলেছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।"

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তাকে হত্যা করো না। কারণ, তুমি যদি তাকে হত্যা করে ফেলো, তবে সে তোমার সেই মর্যাদায় আসীন হয়ে যাবে, যা তাকে হত্যা করার পূর্বে তোমার ছিল; আর তুমি তার সেই অবস্থানে চলে যাবে, যা এই কলেমা বলার পূর্বে তার ছিল।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০১৯)

সুতরাং, যত পুরনো সাহাবীই হোন না কেন, তাঁরাও যদি এমন কোনো কাজ করতেন, তবে মহানবী (সা.) তা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কিন্তু আজকালকার আলেমদের অবস্থা দেখুন!

পাকিস্তানে আহমদীদের কলেমা পড়া সত্ত্বেও যে জুলুমের শিকার বানানো হয়, তার কোনো সীমা নেই। এই অত্যাচারীদের বিষয়ে মহানবী (সা.) এই বর্ণনায় ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, এখন যারা এসব চরমপন্থী মৌলবিদের পেছনে চলছে, তাদের এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

এরপর এই প্রসঙ্গেই একটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সকাল বেলা আমরা জুহায়নার 'উরাকাত'-এ পৌঁছি; উরাকাত হলো জুহায়না গোত্রের এলাকার একটি গ্রামের নাম। সেখানে আমি এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলি, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠে, কিন্তু তবুও আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে বসি। এরপর এ কারণে আমার মনে খচখচ করতে থাকে; কেননা সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিল, আর এরপরও আমি তাকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এর উল্লেখ করি। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিল, আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেলেছ?" আমি নিবেদন করি, "হে আল্লাহর রসূল (সা.)! সে তো কেবল অস্ত্রের ভয়ে এ কথা বলেছিল।" তিনি (সা.) বলেন, "তুমি তার বুক চিরে দেখলে না কেন, যাতে তুমি জানতে পারতে যে, সে অন্তর থেকে এটি বলেছিল নাকি বলেনি?" তিনি (সা.) আমার সামনে এই কথাটি বারবার আওড়াতে থাকেন, এমনকি আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হায়! আমি যদি আজকেই ইসলাম গ্রহণ করতাম! [সহীহ মুসলিম, (অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৮-৮৯, হাদীস-১৩২]

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! জান্নাত ও জাহান্নাম ওয়াজিব বা অবধারিতকারী দুটি বিষয় কী?' তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আগুনে (তথা জাহান্নামে) প্রবেশ করবে।'

[সহীহ মুসলিম, (অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৪-৮৫)

হযরত মাহমুদ বিন লবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদেও ব্যাপারে যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই, তা হলো শির্‌কে আসগর (তথা ছোটো শিরক)।' সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শিরকে আসগর কী?' তিনি (সা.) বলেন, 'রিয়া' তথা লোক দেখানো কাজ। কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাদের আমল বা কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বলবেন, 'যাদের জন্য তোমরা পৃথিবীতে লোক দেখানো কাজ করতে, [তোমাদের যেসব কাজ লোক দেখানোর জন্য ছিল,] তাদের কাছেই যাও এবং দেখো তাদের কাছে তোমরা কোনো প্রতিদান পাও কি না। [এখন ক্ষমা চাইতে হলে তাদের কাছেই চাও, তারপর দেখো তোমরা কী পাও।] (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৯৯, হাদীস-৪০৩০)

কাজেই, মানুষের কাছ থেকে কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে লোক দেখানো কাজ করা বা তোষামোদ করা ঠিক তেমনই, যেমন আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে কাউকে দাঁড় করানো; আর এটি হলো শির্‌ক, যা আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে অপছন্দ করেন। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

(সূরা আল-আনআম :৮৩)

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায় দ্বারা কলুষিত করেনি। তখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা বলেন, 'আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে যুলম বা অন্যায় করেনি? আমাদের অনেকেই এমন আছে, যারা টেরও পাই না, অথচ অন্যায় করে বসি।' তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (সূরা লুকমান:১৪)অর্থাৎ, নিশ্চয়ই শিরক এক মহাঅন্যায়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৩২)

তখন আল্লাহ্ তালার পক্ষ থেকে এই উত্তর চলে এলো যে, শিরক হলো অনেক বড়ো অন্যায়। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করাই হলো শির্‌ক। আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে শিরকের কোনো দিক লুকিয়ে আছে কি না, কারণ এটি অনেক বড়ো অন্যায়। বুখারীর যে সংস্করণটি আমাদের থেকে ছাপা হয়েছে, তাতে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রাহে.) যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (তথা নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড়ো যুলম)। যুলমের অর্থ হলো, وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهٖ অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখা। সব ধরনের অনৈতিকতা ও অবৈধ বিষয় যুলমের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। 'কুফরুন দূনা কুফরিন' (তথা এক কুফরের চেয়ে অন্য কুফর ছোটো) শিরোনামের অধীনে শিরককে সবচেয়ে বড়ো কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সাধারণ অনৈতিকতাকেও কুফর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। [সাধারণ অনৈতিকতাকেও কুফর আখ্যা দেওয়া হয়েছে;] এটি হলো এর সূক্ষ্ম দিক। এরপর 'যুলমুন দূনা যুলমিন'(তথা এক অন্যায়ের চেয়ে অন্য অন্যায় ছোট) শিরোনামের অধীনে শিরককে সবচেয়ে মহাঅন্যায় সাব্যস্ত করে বলেছে, এটি কেন এত বড়ো পাপ। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ গুণাবলি, অর্থাৎ উলুহিয়্যাত (ঈশ্বরত্বের)-এর গুণ অন্য কারও প্রতি আরোপ করা হয়।

[উলুহিয়্যাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অন্য কারও প্রতি আরোপ করা হয়।] ইবাদত অর্থাৎ ভালোবাসা ও আনুগত্য, যা মূলত আল্লাহ্ তাআলার

অধিকার, তাতে অন্যদের অংশীদার বানানো হয়। মানুষ, যে কি না তাঁর বান্দা ছিল এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এসেছিল,

সে নিজের প্রবৃত্তির বা নিজের মতো অন্য কোনো মানুষের অথবা তুচ্ছ কোনো সত্তার দাসে পরিণত হয়ে নিজেকে সেই মর্যাদা থেকে

অনেক নিচে নামিয়ে ফেলে, যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। হুকুকুল ইবাদ (তথা বান্দার প্রাপ্য অধিকার)-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ যেমন অন্যায়, এটিও একটি অন্যায়। হুকুকুল্লাহ্ (বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার)-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ এর চেয়েও বহুগুণ বড়ো অন্যায়। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের যে অন্যায় করা হয়, তা তো হয়ই, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকারগুলো যথাযথভাবে প্রদান করা করাও অন্যায়। এটি যুলম বা অন্যায়ের মর্মার্থ, যা শিরকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। শির্‌ক মূলত মানুষের চূড়ান্ত পূর্ণতার বিনাশক। (কুরআনের) আয়াত ও হাদীসের আলোকে দলীল উপস্থাপন করে ইমাম বুখারী এটি বুঝিয়েছেন যে, পরিপূর্ণ ঈমান হলো তা-ই, যা শির্‌কের

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (সূরা আল-আনআম :৮৩) (অর্থাৎ) পরিপূর্ণ ঈমান ও হিদায়াত এমন লোকদেরই প্রাপ্য, যাদের ঈমানে কোনো প্রকার শির্ক ও অন্যায়ের মিশ্রণ নেই। ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না একদিকে এর সাথে সৎকর্ম যুক্ত হয় এবং অন্যদিকে তা সব ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত থাকে; কেননা শির্ক, পাপ এবং সব ধরনের কুফর একে ত্রুটিপূর্ণ করতে থাকে।"

(সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৯ ,প্রকাশক- নাযারত ইশাআত)

কাজেই, এটি হলো তৌহীদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং শির্ক থেকে পবিত্র হওয়ার সেই মানদণ্ড, যা মহানবী (সা.) আমাদের জানিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'লা বলেন: আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এটি তার জন্য সমীচীন ছিল না। আর সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এটি তার জন্য সমীচীন ছিল না। তার আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি হলো তার একথা বলা যে, আমি তাকে কখনোই পুনরায় সৃষ্টি করব না, (অর্থাৎ পরকালীন জীবনকে সে অস্বীকার করছে, আর এটি হলো আল্লাহ্কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) ঠিক যেভাবে আমি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আর তার আমাকে গালি দেওয়ার বিষয়টি হলো তার একথা বলা যে, তিনি এক পুত্রসন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি অমুখাপেক্ষী। আমি (কাউকে) জন্ম দেইনি এবং আমাকেও (কেউ) জন্ম দেয়নি। আর আমার কোনো সমকক্ষও নেই। না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন, না তাঁকে জন্ম দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অংশীদার নেই।" (সহীহ আল বুখারী, কিতাব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৪৯৭৫)

সূরা ইখলাসের এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:"আল্লাহ্ তা'লা বলেন,'***আল্লাহুস সামাদ***'। আল্লাহ্ এমন সত্তা, সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি (আ.) বলেন, এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে, [এই যে ছোটো বাক্যটি] যা এক লাইনের সমানও নয়, ভেবে দেখা উচিত, কত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে সব ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। [আল্লাহ্ তা'লাকে এটি সব ধরনের শির্ক থেকে পবিত্র করে দিয়েছে।] এর বিশদ বিবরণ হলো, বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদারিত্ব চার প্রকার হয়ে থাকে। [যৌক্তিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, অংশীদারিত্ব চার প্রকার হতে পারে] কখনো অংশীদারিত্ব সংখ্যার নিরিখে হয়ে থাকে, [অর্থাৎ সংখ্যায় এক, দুই, তিন হওয়া।] কখনো মর্যাদার দিক থেকে হয়, [অর্থাৎ কারও মর্যাদা উন্নত হওয়া।] কখনো বংশগতভাবে হয়, [অর্থাৎ পারিবারিক বংশে]। কখনো কর্ম ও প্রভাবের দিক থেকে হয়, [অর্থাৎ কর্মের দিক থেকে এবং এর পরিণামের দৃষ্টিকোণ থেকে।] কাজেই, এক্ষেত্রে খোদা তা'লাকে এই চার প্রকার অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর সংখ্যায় এক; দুই বা তিন নন। আর তিনি 'সামাদ', অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের মর্যাদা, তাঁর অপরিহার্যতার মর্যাদা এবং অন্য সবার তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক থেকে তিনি একক। [তাঁর যে মোকাম রয়েছে, তাঁর যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তাঁর কারও মুখাপেক্ষী না হওয়ার যে বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, স্বতন্ত্র] আর তিনি ব্যতীত বাকি সব কিছুই সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং নিজ সত্তায় ধ্বংসশীল। [যা তাদের নিজ সত্তায় ধ্বংসশীল, শেষ হয়ে যাওয়ার মতো; কিন্তু তিনি চিরঞ্জীব-চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।] যারা প্রতিনিয়ত তাঁর মুখাপেক্ষী, [পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর, এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।] আর তিনি **'লাম ইয়ালিদ'** অর্থাৎ তাঁর কোনো পুত্র নেই, যাতে পুত্র হওয়ার কারণে সে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত হয়ে না যায়। আর তিনি 'লাম ইউলাদ' অর্থাৎ তাঁর কোনো পিতা নেই, যাতে পিতা হওয়ার কারণে সে আবার তাঁর অংশীদার না হয়ে যায়। আর তিনি لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا অর্থাৎ তাঁর কর্মকাণ্ডে কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই, যাতে কর্মের দিক থেকে সে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত না হয়। কাজেই, এভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, খোদা তা'লা চার প্রকার শির্ক বা অংশীদারিত্ব থেকেই সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত এবং (তিনি) এক ও অদ্বিতীয়।"(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১৮)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে কোনো এক যুদ্ধাভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের ইমামতি করে নামায পড়াতেন এবং (প্রতি রাকাতেই) তিলাওয়াতের পর 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করে তা শেষ করতেন। অর্থাৎ শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। যখন তারা অভিযান থেকে ফিরে এলেন, তখন নবী করীম (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি (সা.) বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো সে কেন এমনটি করত? এরপর তারা যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, সে বলল, 'কারণ এটি রহমান আল্লাহ্র গুণাবলিতে পরিপূর্ণ তাই আমি এটি পড়তে ভালোবাসি।' তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 'তাকে বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ভালোবাসেন। এতে আল্লাহ্ তা'লার তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে, তাই জেনে রেখো যে আল্লাহ্ও তোমাকে ভালোবাসেন।' (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস-৭৩৭৫)

সাহাবিদের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং তাওহীদের প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মসজিদে কুবায় তাদের ইমামতি করতেন। তিনি যখনই নামাযে কোনো সূরা পড়তেন, তখন কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ দিয়ে শুরু করতেন এবং সেটি শেষ করে তারপর অন্য সূরা পড়তেন। তিনি এটি প্রতি রাকাতে করতেন। প্রথম ঘটনাটি ছিল কোনো অভিযানে যাওয়া কাফেলার, আর এটি ছিল একটি এলাকার স্থানীয় ইমামের ঘটনা। তার সাথীরা যখন তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলল যে, তুমি এই সূরাটি পড়ো আর মনে করো যে এটি তোমর জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তুমি এর সাথে অন্য আরেক'টি সূরা পড়ো। হয় তুমি শুধু এটিই (সূরা ইখলাস) পড়ো নয়তো এটি ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তিনি বললেন, আমি এটি ছাড়তে পারব না। যদি তোমরা পছন্দ করো আমি যেভাবে পড়ছি সেভাবেই তোমাদের ইমামতি করি তবে আমি করব, আর যদি তোমরা আমার এই সূরা পড়া অপছন্দ করো তবে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি, আমার ইমামতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মনে করত কেননা তিনি তাদের মধ্যে যোগ্য ছিলেন আর তারা তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইমামতি করবে তা পছন্দ করত না।

যাইহোক, যখন নবী করীম (সা.) তাদের কাছে এলেন, তখন তারা তাঁকে (সা.) এই বিষয়টি জানালেন যে এই ব্যক্তি প্রতি রাকাতে এবং প্রতি সূরার আগে সূরা ইখলাস পাঠ করেন। তিনি (সা.) বললেন, 'হে অমুক! তোমার সাথীরা যা বলছে তা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর কোন জিনিস তোমাকে প্রতি রাকাতে এই সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করছে?' তিনি (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি একে ভালোবাসি।' তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 'নিশ্চয় এর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে গিয়েছে।' অর্থাৎ সূরা ইখলাসের প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতি করে দিয়েছে।

(জামে তিরমিযি, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস-২৯০১)

নবী করীম (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি এবং তরবিয়ত সাহাবিদেরও তাওহীদের পথ দেখানোর এক মিনার বানিয়ে দিয়েছিল। বুখারীর একটি বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, এই সূরাটিকে রসূলুল্লাহ (সা.) 'সুলুসুল কুরআন' বা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ ঘোষণা করেছেন। এর তাফসীরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন যে, 'এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হবার অর্থ এটি নয় যে, এটি আয়তনে কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ, বরং এর অর্থ হলো এর বিষয়বস্তু বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কুরআন ও হাদীস পাঠে জানা যায় যে, শেষ জামানায় দুটি বড়ো ফেতনার সৃষ্টি হবে-একটি দাজ্জালী ফেতনা এবং অন্যটি ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেতনা। আর এই উভয় ফেতনা একের পর এক ইসলামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। একটি ফেতনা এক খোদার পরিবর্তে তিন খোদার আকিদা পোষণ করে অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা। আর অন্যটি হলো নাস্তিকতা, যারা খোদাকেই অস্বীকার করে। কুরআন করীম এই উভয় ফেতনার আকিদাকে খণ্ডন করেছে এবং সঠিক আকিদা উপস্থাপন করেছে। কুরআন 'পিতা ঈশ্বর'-এর কথায় ভরপুর এবং একইভাবে তাঁর রব হওয়া ও এক হবার সমর্থন করে অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তাঁর একত্বের সমর্থন করে আর অন্যদিকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ধারণাকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তা'লা এই কথাকে খণ্ডন করেন যে অন্য কেউ খোদা হতে পারে। কুরআন মাজীদ খোদার একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পুত্র ও পবিত্র আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করেছে। তাই এটি পরিষ্কার বিষয় যে, যেহেতু এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র বর্ণনা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বিষয়বস্তু, তাই সূরা ইখলাসও কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের কাজ হলো তাওহীদকে প্রমাণ করা এবং ভ্রান্ত আকিদাকে মিটিয়ে দেওয়া। অতএব, যখন এই সূরাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তসারে ও অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে সেই বিষয়বস্তু আদায় করে দিল যার মাধ্যমে ভ্রান্ত আকিদা বাতিল হয় এবং মিথ্যা প্রতিপন্য হয় এবং তাওহীদের সত্যতা প্রকাশিত হয়, তখন এই সূরাটি কেবল এক-তৃতীয়াংশই নয় বরং পুরো কুরআনের সমতুল্য হয়ে গেল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই সূরাটিকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা কোনো অতিরঞ্জন নয়, বরং এর বিষয়বস্তুর গুরুত্বের খাতিরেই তিনি এমনটি বলেছেন।(তফসীরে কবীর, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩৭২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'মনে রেখো! নিশ্চয় সত্য তাওহীদ কেবল নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। যেমনটি আমাদের নবী (সা.) আরবের নাস্তিক ও ধর্মহীনদের হাজার হাজার আসমানী নিদর্শন দেখিয়ে খোদার অস্তিত্বের দিকে নিয়ে এসেছেন। আজও নবী করীম (সা.)-এর সত্য ও পূর্ণ অনুসারীরা সেই নিদর্শনগুলো নাস্তিকদের সামনে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে। এটাই বাস্তবতা যে, যতক্ষণ পর্য ন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি প্রত্যক্ষ না করে, ততক্ষণ শয়তান তার অন্তর থেকে বের হয় না। আর না তার অন্তরে সত্য তাওহীদ প্রবেশ করে, আর না সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বের বিশ্বাসী হতে পারে। আর এই পবিত্র ও পূর্ণ তাওহীদ কেবল তাঁর (সা.)-এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়।' (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২২, পৃ ১২১)

আজ এই যুগে কর্মের দিক থেকে তাওহীদ মানার দাবিদাররাও-যারা বাহ্যত বলে আমরা আল্লাহ্কে এক মানি-তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের ফেতনা তো আলাদা বিষয়, সেগুলো বাইরের ফেতনা। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও প্রকৃত তাওহীদের উপলব্ধি অবশিষ্ট নেই। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর দাসকে মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মাওউদ রূপে আসার প্রয়োজন ছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি এসেছেন এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন।

সুতরাং প্রকৃত বায়াতের শর্ত তখনই আমরা পালন করতে পারব যখন আমরা প্রকৃত অর্থে তাওহীদে বিশ্বাসী হবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৩শে মার্চ যখন নিজ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মার্চ মাসেই আমরা এখন অতিবাহিত করছি এবং ২৩শে মার্চের নিরিখে আমরা 'মসীহ্ মাওউদ দিবস'-এর জলসাও করি। এটি এজন্য করি যে, নবী করীম (সা.)-এর দাসকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঠিয়েছেন তা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠিয়েছেন। অতএব, যখন তিনি (আ.) জামা'ত প্রতিষ্ঠা করলেন আর আমরা তাঁর বায়াত করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করেছি যে আমরাও সর্বদা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। আর প্রকৃত তাওহীদের হক তখনই আদায় হবে যখন আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে, নিজের পরিবারের মাঝে এবং নিজের সমাজের মাঝে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল মুসলমানকেও তৌফিক দিন যেন তারা আল্লাহ্‌র এই প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ইয়াজুজমাজুজ ও দাজ্জালী ফেতনাগুলোকে চূর্ণ করে যা আজ অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।

নবী করীম (সা.)-এর ইসরার ঘটনায় একটি বর্ণনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি ইবরাহীমের (আ.) সাথে সে রাতে সাক্ষাত করি যে রাতে আমার ইসরা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার পক্ষ থেকে নিজ উম্মতকে সালাম পৌঁছে দিন এবং তাদের জানিয়ে দিন যে, জান্নাত পবিত্র মাটি, সুমিষ্ট পানি ও বিস্তৃত ভূমি বিশিষ্ট। এর তরুলতা সমূহ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৬২)

সুতরাং, একজন মুমিনের এসব যিকর সমূহ এমনই গভীরতা সহকারে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ অনুধাবন করে করা উচিত, তবেই সফলতা। আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করি।

একটি রেওয়াতে এই হাদীসে কুদসীটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে যে দোয়া করেছ এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করেছ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমার মাঝে যা আছে তা সত্ত্বেও। আর আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। অর্থাৎ, এখনো তোমাদের মাঝে দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকবে, কিন্তু আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি; এজন্য তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। হে বনী আদম! যদি তোমার পাপ আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব আর আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। কত পাপ রয়েছে আমি ক্ষমা করার সময় ভ্রুক্ষেপ করি না। আল্লাহ্ তা'লা মালিক (সর্বাধিপতি), তিনি ক্ষমা করতে পারেন। তিনি (আল্লাহ্) বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি ভূপৃষ্ঠের সমান পাপ নিয়ে আমার কাছে আস, এরপর তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত কর, এমন অবস্থায় যে তুমি আমার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কর নি, তাহলে আমি এর সমান ক্ষমা তোমার কাছে নিয়ে আসবো। ভূপৃষ্ঠের সম পরিমাণ যদি পাপ করে থাক কিন্তু যদি শিরক না করে থাক এবং আমার প্রতি ভয় থাকে এবং আমার তওহীদের ঘোষণা করে থাক এবং আমল করার চেষ্টা করে থাক; তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫৪০)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সকল ভুল-ত্রুটি, সকল পাপ ক্ষমা করে দেন যখন মানুষ তাঁর কাছে বিনয়ী হয়ে যায়, কিন্তু শর্ত হলো শিরক যেন না করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের অধিকার আদায় করে থাকে এটিও আবশ্যক। যেভাবে পূর্বে আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি শুধু মেনে নেয়া যথেষ্ট নয়। কার্যত নিজের প্রতিটি কাজ দ্বারা সাব্যস্ত করতে হবে খোদা তা'লা এক-অদ্বিতীয়।

একইভাবে তওহীদের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একটি রেওয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমাকে কোন এমন বিষয় শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি তোমার যিকরও করবো এবং তোমার কাছে দোয়াও করবো। তখন আল্লাহ্ তা'লা বললেন, হে মূসা! বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করলেন, হে আমার খোদা! তোমার সকল বান্দা এটিই বলে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই বলে। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বললেন, বল- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করলেন, তুমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। হে আমার প্রভু! আমি তো এমন কোন কিছু শিখতে চাই যা বিশেষভাবে আমার জন্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা বললেন, হে মূসা! আমি ব্যতিত যদি সাত আকাশ ও এর অধিবাসীদের এবং আমি ব্যতিত সাতটি পৃথিবী এক পাল্লায় রাখা হয়, সমগ্র পৃথিবী ও সাতটি ভূপৃষ্ঠ এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে এক পাল্লায় রাখা হয়; তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসব কিছুর চেয়ে ভারী হবে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু বস্তু রয়েছে এবং যে বসতি রয়েছে, যত পুণ্য রয়েছে; এসব কিছুকে একদিকে রেখে দাও এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে একদিকে রেখে দাও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর পাল্লা ভারী হবে। (আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, কিতাবুদ দুয়া, ১ম খণ্ড, পৃ ৭১০, হাদীস-১৯৩৬, প্রকাশক: দারুল কিতাবুল ইলমিয়া)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) একটি আপত্তির উত্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর কলেমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, হযরত পবিত্র নবীর শিক্ষা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। এটি পড়লে পাপ মোচন হয় এটি একেবারে সঠিক কথা। আর এটাই অকাট্য সত্য, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সেই এক আল্লাহ্‌ই প্রেরণ করেছেন-তবে যদি তার জীবনাবসান এই কলেমার উপরেই হয়, তবুও নিঃসন্দেহে সে নাজাত লাভ করবে। আকাশের নিচে কারো আত্মহত্যার মাধ্যমে কখনো মুক্তি লাভ হয় না। আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড়ো উম্মাদ আর কে হতে পারে যে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা এবং তাঁকে এমন পরম দয়ালু জ্ঞান করা যে তিনি এরূপ দয়াপরবশ হয়ে মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রিয় রসূল প্রেরণ করেছেন যার পবিত্র নাম হল; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। এটি এমন এক আক্বীদা যার ওপর বিশ্বাসের দরুন মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে হয়ে যায় আর আত্মিক প্রবৃত্তি অপসারিত হয়ে তার স্থলে তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশেষে তওহীদের শক্তিশালী প্রভাব সমগ্র হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করে এবং এ জগতেই এক জান্নাতসম জীবন শুরু হয়ে যায়। যেমনটি তোমরা প্রত্যক্ষ করে থাক যে, আলো উপস্থিত হলে অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না। তেমনই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন আত্মার অন্ধকার প্রবৃত্তিসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাপের প্রকৃত স্বরূপ হলো- অবাধ্যতার সংমিশ্রনে আত্মিক কামনা-বাসনার উত্থান হয় অর্থাৎ আত্মিক কামনা-বাসনা আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে। যার অনুসরণে কোন ব্যক্তির নাম পাপী রাখা হয়। (যখন কোন ব্যক্তি পুণ্যের বিপরীত কাজ করে তখনই সে পাপী সাব্যস্ত হয়)। আরবী ভাষার আলোকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ হচ্ছে- لَا مَطْلُوْبَ لِيْ وَلَا مَحْبُوْبَ لِيْ وَلَا مَعْبُوْدَ لِيْ وَلَا مُطَاعَ لِيْ اِلَّا اللّٰهُ ; অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো প্রেমাস্পদ নেই, কোনো উপাস্য নেই এবং কোনো অনুসরনীয় নেই যাকে অনুসরণ করবো। স্পষ্টতই, এই মর্মার্থ পাপের প্রকৃত অর্থ ও তার মূল উৎসের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই অর্থগুলোকে নিজের অন্তরে স্থ ান দেবে তখন (যে কথাগুলো বলা হল তা গুরুত্বের দাবী রাখে সেগুলো) তার অন্তর থেকে সকল বিপরীত প্রবণতা দূর হয়ে যাবে। ভিন্ন কোন বিষয় তার অন্তরে স্থান পাবে না। কারণ তখন সে আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলীর অনুসরণ করবে এবং প্রকৃত তওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে। কেননা, পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। যখন আত্মিক প্রবৃত্তি দূর হয়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকেই প্রকৃত পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা বলা হয়ে থাকে। আর আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের প্রতি ঈমান আনয়ন করা কলেমার দ্বিতীয়াংশেরই প্রকৃত মর্মার্থ। এর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার বাণীর উপরও পূর্ণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, যে ব্যক্তি এটি স্বীকার করে যে আমি আল্লাহর আনুগত্য করতে চাই, তার জন্য অপরিহার্য যে সে তাঁর নির্দেশসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর সেই নির্দেশসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর নয়, যদি না সে সেই প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদের কাছে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। তার (প্রেরিত ব্যক্তির) ওপর ঈমান আনাও আবশ্যক। সুতরাং, এটাই কলেমার প্রকৃত তাৎপর্য।" (নুরুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪২০)

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন: "শিরক থেকে বিরত থাক। যদি এটি পিঁপড়ার পদচিহ্নের চেয়েও সূক্ষ্ম হয় তবুও।" (অর্থাৎ পিঁপড়ার পায়ের চেয়েও ছোট এই শিরক) তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা কীভাবে এর থেকে রক্ষা পেতে পারি যখন কিনা তা পিঁপড়ার পদচিহ্নের চেয়েও সূক্ষ্ম?" তিনি (সা.) বললেন, তুমি এই দোয়াটি পাঠ করো:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ ـ

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন আন নুশরিকা বিকা শাইয়ান না'লামুহু ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লাম)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন আমরা জেনে-বুঝে তোমার সাথে কাউকে শরিক না করি; আর যা অজান্তে হয়ে যায়, তার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" সর্বদা আল্লাহ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকো। (মুসনাদ আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৬১৪-৬১৫)

হযরত আবদুর রহমান বিন আবযা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) প্রত্যুষে এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

(উচ্চারণ: আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলামে ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলাসে ওয়া আলা দ্বিনী নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন। ওয়া আ'লা মিল্লাতে আবিনা ইব্রাহিমা হানিফান মুসলিমাও ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন)

আমরা ইসলামের প্রকৃতি, দৃঢ়তার বাণী, একত্ববাদের সাথে জাগ্রত হলাম এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের উপর ও আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতি যারা একেশ্বরবাদী মুসলমান ছিলেন আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সকালে জাগ্র ত হয়েই প্রথমে এটি স্মরণ করো, সর্বদা আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করো।

(মুসনাদ আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ ২৯৪-২৯৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সন্ধ্যা হতো তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

(উচ্চারণ: আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু)

আমরা এবং সমস্ত বিশ্ব আল্লাহ তা'লার জন্য সন্ধ্যা করেছি আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর তিনি এক এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দাওয়াত, হাদীস-২৭২৩)

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ আসলামি নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে এই বলে দোয়া করতে শুনেছেন আর সে এই বলে দোয়া করছিলো যে, "হে আল্লাহ! আমি এই কথার সাক্ষ্য দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়। তুমি এক ও অদ্বিতীয়, তুমি অমুখাপেক্ষী। তুমি কাউকে জন্ম দাও নি আর তোমাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তোমার সমতুল্য কেহ নাই"। তিনি বলেন- মহানবী (সা.) এটি শুনে বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহর সমীপে সর্বশ্রেষ্ঠ নামের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করেছে এর মাধ্যমে যখনই প্রার্থনা করা হয় তিনি তা কবুল করেন আর যখন এর দোহাই দিয়ে চাওয়া হয় তখন তিনি দিয়ে থাকেন"। (জামে তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৭৫)

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন যে, আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিখাবো না যা তুমি কাঠিন্য ও বিপদের সময় পাঠ করতে পারো? সেই বাক্যাবলী হলো- اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا۔ (উচ্চারণ: আল্লাহু আল্লাহু রাব্বি লা উশরিকু বিহী শাইয়া) আল্লাহ, আল্লাহ আমার প্রভূ প্রতিপালক! আমি তাঁর সমতুল্য কাউকে মনে করি না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫২৫)

(ইবনে মাজা-৩৮৮২) বিপদের সময় কী পাঠ করতে হবে লোকেরা তা জিজ্ঞেস করে তো সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি দোয়া। একটি বর্ণনায় এসেছে

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বিচলিত অবস্থায় এভাবে দোয়া করতেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালিমু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল আযিম")

সেই আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই যিনি মহান এবং মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রভু প্রতিপালক। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস: ৬৩৪৬)

কতই না সূক্ষ্মভাবে মহানবী (সা.) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিতেন।

এক বর্ণনায় এসেছে হযরত আবু রিমসা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমাকে আপনি আপনার সেই জিনিসটি দেখান যা আপনার পিঠে রয়েছে, অর্থাৎ নবুওয়্যতের মোহর। কেননা আমি একজন চিকিৎসক।

তিনি (সা.) বলেন, চিকিৎসক তো মহান আল্লাহ তা'লা আর তুমি তাঁর সহায়ক। তুমি অসুস্থকে শান্তনা দাও আর আশ্বস্ত করো। চিকিৎসক তো তিনি যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আরোগ্যদাতা। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২০৭)

যুগ খলীফার বাণী

যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর সমতুল্য কেহ নাই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল এবং হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও তাঁর দাসীর পুত্র আর তার বাণী যা তিনি মরিয়মের প্রতি ইলক্বা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক আত্মা আর জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য। আল্লাহ তা'লা তাকে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যে দরজা দিয়ে চাইবেন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন"।

উমায়ের বিন হানী একই বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনিও এর সত্যায়ন করেছেন কিন্তু তিনি এই কথার উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'লা তাঁকে এটি বলেননি যে,জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য দিয়ে যেটির মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করাতে চান। অর্থাৎ অপর রেওয়ায়েতটিতে এর আটটি দরজার কথা উল্লেখ করা হয় নি।

হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হলো, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সব কিছুর উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করা, আর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমজানের রোযা রাখা।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১৬)

হযরত ইয়াসিরা (রা.) থেকে, যিনি মুহাজির নারীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বর্ণিত আছে যে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের নারীদের ওপর আবশ্যক যে, তোমরা তাসবীহ, তাহলীল (মহিমা ঘোষণা) এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো এবং অলসতা করো না, নতুবা তোমরা তাওহীদকে ভুলে যাবে। আর আঙুলের ওপর গণনা করতে থাকো, কারণ নিশ্চয়ই আঙুলগুলো কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদেরকে কথা বলার জন্য বলা হবে; অর্থাৎ গুণে গুণে আল্লাহর জিকির করতে থাকো, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো, আল্লাহর একত্ব বর্ণনা করো, তাঁর তাসবীহ করো। (আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, কিতাবুদ দুয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৩২, হাদীস-২০০৭)

অতএব মহানবী (সা.) কোনো সুযোগে, কোনো সমাবেশে, কোনো শ্রেণির মধ্যে এই বিষয়টি উম্মতের অন্তরে বসানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি অর্থাৎ যেখানে তিনি আল্লাহ তা'লার একত্ব এবং তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেননি, (এমনটি হয়নি)। এই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এক স্থানে লিখেছেন, বরং খুতবাতেই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে,

"মহানবী (সা.)-এর এ বিষয়ে এমন প্রবল উদ্দীপনা ছিল যে, তাঁর বিরোধীরাও এ কথা স্বীকার করে যে, তিনি (সা.) উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বক্ষণ আল্লাহই আল্লাহ ডাকতেন। অতএব ফ্রান্সের জনৈক ইতিহাসবিদ Alphonse de Lamartine লিখেছে, আর যাই হোক, মহানবী (সা.)-এর ওপর যেকোনো অভিযোগ আরোপ করা হোক না কেন, (তিনি বলছেন লেখক লিখছেন, যিনি একজন ইতিহাসবিদ) কিন্তু আমার কাছে তাঁর মাঝে এমন একটি বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মধ্যে, পৃথিবী প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়নি। এটি এমন একটি বিষয় যা আমি কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখিনি, আর তা হলো, যখন থেকে তিনি নবুয়তের ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন থেকে নবুয়তের ঘোষণা করেছেন, এই ইতিহাসবিদ লিখছেন, সেই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জিহ্বায় একটি শব্দই ছিল, আর তা ছিল 'আল্লাহ'। যেন তাঁর একটি ধ্যান ছিল এবং এক ধরনের উন্মাদনা ছিল যে, আল্লাহর অস্তিত্বে মানুষকে বিশ্বাস করাতে হবে এবং তাঁকে পৃথিবীতে প্রকাশ করতে হবে।

অতএব যারা মহানবী (সা.)-এর এই কাজকে উন্মাদনা বলে যে, তিনি (সা.) সর্বক্ষণ আল্লাহ বলতে থাকতেন, তারাও এ কথার স্বীকার যে, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বড় এবং প্রথম কাজ ছিল আল্লাহকে এবং আল্লাহ তা'লার একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটি উন্মাদনাই হোক, কিন্তু সেটাই সেই বিষয় যে, এই উন্মাদনার অধিকারীকে পরবর্তীকালের মানুষ পূর্ণাঙ্গ মনে করেছে, আর যদি পূর্ণাঙ্গ না-ও মনে করে, তবে অন্তত এতটা তো বিশ্বাস করেছে যে, এমন ব্যক্তি খারাপ হতে পারে না, যিনি দিনরাত আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকেন এবং তাঁর একত্ব ও তাঁর গুণাবলি প্রতিষ্ঠার চিন্তায় সর্বক্ষণ লেগে থাকেন। যাইহোক, **মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থাকে দেখে জানা যায় যে, তাঁর (সা.) এবং সকল নবীদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল শিরক দূর করা এবং আল্লাহ তা'লাকে মানানো, তাঁর একত্বকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া।**"(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৬০-২৬১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে এটিও লিখেছেন যে, এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত, মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা যতই উচ্চ হোক এবং তাঁর প্রতি

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

আমাদের যতই ভালোবাসা থাকুক, (খুতবায় তিনি এটিও বর্ণনা করেছেন যে) আল্লাহ তা'লার মর্যাদা সর্বাবস্থায় তাঁর মর্যাদার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'লা অনাদি ও অনন্ত, এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুগ্রহসমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত মহান অনুগ্রহ। এবং এটি তাঁর সত্তার প্রতি শত্রুতা হবে যে , আমরা তাঁকে এমন কোনো মর্যাদা দিই, যার ফলে আল্লাহ তা'লার মর্যাদা হ্রাস পায়; কারণ মহানবী (সা.) নিজেও কখনো এটি পছন্দ করতেন না, যেমন আমি পূর্বে হাদিসগুলোতে বর্ণনা করেছি যে, তাঁকে আল্লাহ তা'লার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রতিটি কাজই এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ, এবং যেসব বড় বড় কাজ করার তৌফিক তাঁকে (সা.) দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতার কাজ, যা কোনো মানুষের সাধ্যের মধ্যে ছিল না; বরং কেবল আল্লাহ তা'লার শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব ছিল, এমন কাজ যা সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষও করতে পারে না। কিন্তু যখন মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থা ছিল, সে সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়ে থাকে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আগে মনে করতাম যে, যার মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট বেশি হয়, সে ভালো মানুষ নয়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় মানুষ অস্থির হলে সে ভালো নয়, কিন্তু যখন আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তখন আমাকে আমার মত পরিবর্তন করতে হলো। সেই চরম কষ্টের সময়েও তাঁর আল্লাহ তা'লার মর্যাদার প্রতি এতই খেয়াল ছিল, যেহেতু তিনি জানতেন যে, আমার অনুসারীদের আমার প্রতি এত ভালোবাসা আছে, আমার মান্যকারীদের আমার প্রতি এত ভালোবাসা আছে যে তারা আমার মর্যাদা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে পারে, অতিরঞ্জন করতে পারে, তাই সেই কষ্টের সময় বারবার তাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হচ্ছিল যে, আল্লাহ তা'লা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর অভিশাপ করুন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে। তিনি বারবার এটিই বলছিলেন। **যেন তাঁর জাতির জন্য শেষ অবস্থায় এবং শেষ শিক্ষা হিসেবে তিনি এটিই দিয়েছেন যে, আমাকে কোনো অংশীদারত্বপূর্ণ মর্যাদা দিও না এবং যদি তোমরা তা করো, তবে এটা মনে করো না যে আমি এতে সন্তুষ্ট হব; বরং আমার আত্মা এমন মানুষদের ওপর অভিশাপ দেবে, যারা এমন কাজ করবে।**

অতএব, মহানবী (সা.) হলেও, তাঁর প্রতি এমন কোনো মর্যাদা আরোপ করা যা আল্লাহ তা'লার মর্যাদার হ্রাস ঘটায়- তা তাঁর জন্য আনন্দের কারণ নয়; বরং এমন ব্যক্তির ওপর তাঁর অভিশাপ হয়, এবং মৃত্যুকালের অভিশাপ তো অত্যন্ত ভয়ংকর। যারা সত্যধর্মের অনুসারী নয়, যেমন হিন্দুরা, তারাও মৃত্যুকালের অভিশাপকে খুব ভয় করে। মা-বাবা মারা গেলে তাদের অভিশাপকেও মানুষ ভয় করে। কিন্তু যখন আল্লাহর রাসূল, যিনি সকল নবীর নেতা, তিনি এমন অবস্থায় বলেন যে , তোমাদের ওপর অভিশাপ, এবং মৃত্যুর সময় এই বদদোয়া করেন, তখন এর গুরুত্ব কত বেশি হওয়া উচিত এবং এটি কত বড় অভিশাপ! এ থেকে আমাদের বাঁচা উচিত। কিন্তু তাঁর মাজারে তো নয়, যেমন আমি পূর্বেও একবার বলেছি, কিন্তু পীর-ফকিরদের মাজারগুলোতে এই কাজই করা হয়, এবং এটি মহানবী (সা.)-এর এই দোয়ার আলোকে অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২০, পৃ: ৬০০-৬০০১)

অতএব আমরা যারা তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের অনুসারী, আমাদের উচিত এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা যে, আমরা তাওহীদের প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি সৃষ্টি করে মহানবী (সা.)-এর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বেদনা ছিল তা বুঝে, তার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে প্রকৃত একত্ববাদী হয়ে উঠি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

যুদ্ধের পরিস্থিতিও ক্রমাগত সবচেয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং ইসরায়েল এই প্রচেষ্টায় রয়েছে যে, তাদের প্রাধান্য পুরো পৃথিবীতে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় প্রথম আক্রমণের সময় বলেছিল যে, এখন এই অঞ্চলের, বরং আরব দেশগুলোরও মানচিত্র পরিবর্তন করা হবে। অতএব এগুলো সেই মানচিত্র পরিবর্তনের প্রচেষ্টা এবং মুসলিম বিশ্ব এখনো বুঝে নিক যে, এরা কোন দিকে এগোচ্ছে, এবং তাদের এক হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান, ইরান এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকার বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা করছে। যাইহোক, যেহেতু মাঝখানে আরব দেশগুলোতেও ক্ষতি হচ্ছে, তাই পাকিস্তান এ দিক থেকে চেষ্টা করছে। এ বিষয়েও ইরানের কিছু মহলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে এটিও ভুল, এবং তারা এমনকি এতদূর পর্যন্ত অভিযোগ করেছে যে ইরানের কিছু মহলে, ইরানের মধ্যে বলা হচ্ছে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে, অথবা বিশ্লেষকদের মধ্যে, যে, পাকিস্তান ইরানের সীমান্তের পাশে নিজের এলাকায় আমেরিকান সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সাহায্য করছে, অথবা এমন লোকদের সাহায্য করছে- যারা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যাইহোক, এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। পাকিস্তান এর অস্বীকার করেছে।

শত্রু এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায়, যাতে মুসলিম দেশগুলো কখনো একে অপরের সাহায্যকারী হতে না পারে। অতএব অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এ দিক থেকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং ইসলামী দেশগুলোকে ঐক্যের মালায় গাঁথারও তৌফিক দান করুন। আমীন। (প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ এপ্রিল, ২০২৬)

১ম পাতার পর.....

আর ঋণগ্রহীতার উপকার হলো, যখন সে ঋণ নেবে তখন সে চিন্তা করবে যে, যে সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সে সময়ের মধ্যে আদৌ পরিশোধ করতে পারবে কি না।

এছাড়াও এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে এজন্য যে, কিছু দুর্বলচেতা মানুষ আপত্তি করতে পারে যে, "আমরা সুদে টাকা দিই এজন্য যে, তাহলে ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ পরিশোধের চিন্তা থাকে এবং সে দ্রুত ঋণমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি সুদ না নেওয়া হয়, তবে তার মধ্যে পরিশোধের অনুভূতি থাকে না।" এই কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য আল্লাহ বলেন: যখন তোমরা পরস্পরকে ঋণ দেবে, তখন একটি লিখিত চুক্তি করে নাও যে, অমুক সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করা হবে, যাতে তোমাদের অর্থও নিরাপদ থাকে এবং অপর ব্যক্তির মধ্যেও দায়িত্ববোধ বজায় থাকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, আর নির্দিষ্ট মেয়াদের নয় এমন ঋণ লিখতে হবে না। কারণ যখনই কোনো ব্যক্তি কাউকে ঋণ দেয়, তখন তা অবশ্যই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই দেয়-সে সময় অল্প হোক বা বেশি। এরপর সে তা ফেরত দাবি করার অধিকারী হয়। এমন কখনো হয়নি যে, কেউ কাউকে ঋণ দিয়েছে অথচ তা ফেরত নেওয়ার কোনো চিন্তাই তার মধ্যে নেই। যদি কাউকে উপহার বা সাহায্যের রূপে অর্থ দেওয়া হয়, তবে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যাকে ঋণ বলা হবে, তা অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই হবে-মৌখিকভাবে সময় নির্ধারণ করা হোক বা না হোক। হ্যাঁ, যদি ঋণ কোনো বিশেষ সময়ের জন্য না হয়ে কেবল এক-দুই ঘণ্টা বা এক-দুই দিনের জন্য হয়, তাহলে তা লিখিতভাবে সংরক্ষণ না করলে কোনো শরয়ী গুনাহ নেই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরা এই দুই বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার কারণে ঋণ দেওয়ার সময় কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে না; বরং বলে দেয়, "যখন ইচ্ছা ফেরত দিও।" আবার তা লিখিতভাবেও সংরক্ষণ করে না। ফলে পরে বহু সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং তাদের তিক্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

"আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়ের সাথে তা লিখে দেবে।"

তৃতীয় নির্দেশ হলো, লেখক যেন অন্য কোনো ব্যক্তি হয়। ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা নিজেরা না লিখে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তা লিখবে। অর্থাৎ, সে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা যোগ করবে না; বরং যা লিখতে বলা হয়েছে, ঠিক তাই লিখবে।

এরপর লেখককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। বরং আল্লাহ তাআলা যেভাবে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই সে লিখবে। অথবা এর অর্থ এইও হতে পারে যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাকে লেখার জ্ঞান দিয়েছেন, তাই সে যেন তা দ্বারা মানুষকে উপকার করতে অস্বীকার না করে। "যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেনচ-এর উভয় অর্থই হতে পারে। এক অর্থ এই যে, তার যতটুকু দক্ষতা আছে, সে অনুযায়ী লিখবে। আরেক অর্থ এই যে, যেহেতু আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই তারও উচিত মানুষের উপকার করা। এমন যেন না হয় যে, সে অস্বীকার করে বসে এবং কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ না পাওয়ার কারণে কষ্টে পড়ে যায়।

"আর যার উপর দায়িত্ব রয়েছে, সে-ই যেন লিখিয়ে নেয়।"

চতুর্থ নির্দেশ হলো, যার উপর ঋণের দায়িত্ব রয়েছে, সেই ব্যক্তি যেন দলিল লিখিয়ে নেয়। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতারই উচিত দলিল লিখিয়ে নেওয়া। এর মধ্যে এক বিরাট প্রজ্ঞা রয়েছে। বাহ্যত তো মনে হতে পারত যে, ঋণদাতারই দলিল লিখিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু তা বলা হয়নি। বরং এই দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার উপর আরোপ করা হয়েছে।

এর কারণ হলো, ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন টাকা পাওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যায়। সে তখন এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে এবং টাকার ব্যাপারে কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তীতে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে সে বলতে পারে, "তখন তো আমার খেয়ালই ছিল না যে কী লেখা হচ্ছে।" তাই তাকে বলা হয়েছে, সে নিজেই যেন লিখিয়ে নেয়, যাতে তার নিজের স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে, ঋণদাতা তো সবসময় সতর্ক থাকেই, কারণ টাকা তার নিজের কাছ থেকে বের হয়েছে। তাই তার মনে অবশ্যই থাকে যে, সে কত টাকা দিয়েছে

আরেকটি কারণ হলো, লিখিত দলিল থাকবে ঋণদাতার কাছে। তাই তার সুযোগ থাকবে দেখে নেওয়ার যে, কোনো ভুল হয়েছে কি না। কিন্তু ঋণগ্রহীতার কাছে দলিল থাকবে না। সুতরাং যদি সেই সময় তার পূর্ণ মনোযোগ দলিলের দিকে না থাকে, তবে তার ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। "এবং তা থেকে কিছুই কমাবে না।"

পঞ্চম নির্দেশ হলো, লিখিয়ে নেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতা যেন ঋণের পরিমাণ থেকে কিছুই কম না করে; বরং সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে তা লিখিয়ে নেয়।

বাহ্যত এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঋণের মধ্যে আবার কীভাবে কমতি হতে পারে, যখন উভয় পক্ষ সামনাসামনি বসে আছে? তাহলে "তা থেকে কিছুই কমাবে নাচ-এই নির্দেশ কেন দেওয়া হলো? মনে রাখা উচিত যে, কিছু ঋণ অত্যন্ত জটিল ধরনের হয়। সেগুলো লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার সময় মানুষ এমন জটিল ভাষা ব্যবহার করে, যার পরিণতিতে পরে ক্ষতি বা কমতির রূপ প্রকাশ পায়। বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, যা বিভিন্ন প্রকার ও শর্তযুক্ত হয়, সেগুলো লিখার সময় নানা ধরনের প্রতারণা করা হয়-যেমন সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেহেতু এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সাধারণত চাতুর্য ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাই আল্লাহ তাআলা বলেন: লিখার সময় সততার সাথে কাজ করো এবং একটি দানাও কমানোর চেষ্টা করো না। (তাফসীরে কবীর, খণ্ড ১, সূরা আল-বাকারার ২৮৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর)

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

মেলবোর্নের মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেবের সাথে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর সত্যতা গ্রহণ (শেষাংশ..)

তিনি প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসনো শহরে বসবাস করতেন। পরে ১৯১৪ সালে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে স্থানান্তরিত হন। তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক বছর এখনো স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত হয়নি। তাঁকে লস অ্যাঞ্জেলেসের "Forest Lawn-Glendale" কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এই বছর লস অ্যাঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্র) সফরের সময় হুযূর-এ-আনোয়ার (আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহায় হোন) আমেরিকার জামা'আতের মুবাল্লিগ ইনামুল হক কাওসার সাহেবকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, চার্লস ফ্রান্সিস (আবদুল হক সাহেব (রা))-এর পরিবারের সদস্যদের সন্ধান করা হোক-তাঁর বংশধররা কোথায় এবং কোন স্থানে বসবাস করছেন তা জানা হোক।

এই বিষয়ে জামা'আতে আহমদিয়া আমেরিকা বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।"

মেলবোর্নে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

আজ জামাআতে আহমদিয়া মেলবোর্ন হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীযের সম্মানে " Princess Reception Centre"-এ একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয নিজ বাসভবন থেকে রওয়ানা হয়ে ছয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে Reception Centre-এ পৌঁছেন এবং একটি মিটিং রুমে তশরীফ আনেন, যেখানে নিম্নোক্ত তিনজন অতিথি হুযূরের আগমন ও সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন।।

১। মেজর জেনারেল পল ম্যাকল্যাচিয়ান (তিনি অস্ট্রেলিয়ান আর্মির প্রধানের প্রতিনিধিত্বে এসেছিলেন)।

২। অনারেবল অ্যান্থনি বায়র্ন, ফেডারেল মেম্বার অব পার্লামেন্ট।

৩। সান্দ্রা মেয়ার, মেয়র অব সিটি ফ্যাঙ্কস্টন।

এই অতিথিবৃন্দ হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হুযূর তাদের পরিচয় গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায় ২২০ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। হুযূরের আগমনের পূর্বেই সকল অতিথি হলে নিজ নিজ আসনে বসে গিয়েছিলেন।

সাতটায় হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয যখন হলে উপস্থিত হন, তখন সকল অতিথি দাঁড়িয়ে হুযূরকে স্বাগত জানান।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্যে ছিলেন-

অনারেবল ইংগা পিউলিচ (এমপি), অনারেবল মারিয়া ভামভাকিনভ (এমপি), অনারেবল জুডিথ গ্রালি (এমপি), অনারেবল লুক ডনেলান (এমপি), অনারেবল গ্রাহাম ওয়াট (এমপি), অনারেবল জেসন উড (এমপি), অনারেবল জুড পেরেরা (এমপি), অনারেবল অ্যান্থনি বায়র্ন (এমপি), ফ্যাঙ্কস্টনের মেয়র, কেসির মেয়র, পোল্যান্ডের কনসাল জেনারেল, বেলজিয়ামের কনসাল জেনারেল, শ্রীলঙ্কার কনসাল জেনারেল, সোমালিয়ার কনসাল জেনারেল, অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের চারজন কর্মকর্তা এবং কিংস্টন, নক্স, কার্ডিনিয়া, কেসি ও ড্যান্ডেনং এলাকার নয়জন কাউন্সিলর।

এছাড়াও "অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি"এবং "মোনাশ ইউনিভার্সিটি-এর পাঁচজন প্রফেসর, নোসাল হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল, ম্যানেজার রিজিওনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর আরএমআইটি, ডিপার্টমেন্ট অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড সিটিজেনশিপের প্রতিনিধিবৃন্দ, ডিএসসি (Sporting Shooters Association)-এর প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নোক্ত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করেন-

"The Australian", "Channel 31", "Asia Pacific ABC Radio", "Dandenong Journal"-এর সম্পাদক, "ABC Channel", চ্যানেল ১০-এর চিফ অব স্টাফ, ইন্টারফেইথ কমিশনের এক্সিকিউটিভ অফিসার, মেজর রবার্ট ইভান্স, কর্পস অফিসার (ক্র্যানবোর্ন Salvation Army), মেজর লিয়ান রুথভেন, ডিভিশনাল সেক্রেটারি (ইস্টার্ন ভিক্টোরিয়া ডিভিশন), আফ্রিকান অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটি সেন্টারের ম্যানেজার, কমিউনিটি অ্যাডভাইজরি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, Ethnic Community Council-এর ভাইস চেয়ারম্যান, Southern Migrant Resource Centre-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান এবং ভিক্টোরিয়া ডেয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।

এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রফেসর এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত অস্ট্রেলিয়ান অতিথিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা আযীযম মনসুর আহমদ দুররানী উপস্থাপন করেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদও পাঠ করেন।

এরপর জামাআতে আহমদিয়া মেলবোর্ন-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মুকাররম সফদর জাভেদ চৌধুরী সাহেব অতিথিদের স্বাগত জানান এবং তাঁর পরিচয়মূলক বক্তব্য পেশ করেন।

কিছু বিশিষ্ট অতিথির বক্তব্য

এরপর কয়েকজন অতিথি তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সর্বপ্রথম সিটি অব ফ্যাঙ্কস্টনের মেয়র সান্দ্রা মেয়ার তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন: "বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের প্রধান সম্মানিত মির্জা মাসরূর আহমদ সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ! আমি খলীফাতুল মসীহকে আমাদের সুন্দর দেশ অস্ট্রেলিয়ায় স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এখানে আপনার অবস্থান আপনার কাছে আনন্দদায়ক হবে। পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজ আমাদের জন্য কতই না চমৎকার ও সম্মানজনক একটি উপলক্ষ যে খলীফাতুল মসীহ, একজন বিশ্বনেতা, আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। এখানে আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও দৃঢ়। আহমদিয়া জামাআতের সুন্দর বাণী 'সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়' আমাদের সামনে রয়েছে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এই বাণী অনুযায়ী জীবনযাপন করত, তবে যুদ্ধের অবসান ঘটত এবং পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। আমি আশা করি, আপনার এই সফর অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

এরপর অনারেবল জুডিথ গ্রেলি, পার্লামেন্ট সদস্য, তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন: "আজ আমি আমার এই এলাকায় খলীফাতুল মসীহকে স্বাগত জানাই। আমার জন্য এটি আনন্দের বিষয় যে আমি বিরোধী দলের নেতার প্রতিনিধিত্ব করছি এবং তাঁর পক্ষ থেকে সমগ্র আহমদিয়া জামাআতকে এই এলাকায় স্বাগত জানাই। আহমদিয়া জামাআতের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাণী 'সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়' প্রতিটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং আমি এই বাণী যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।"

এরপর ফেডারেল পার্লামেন্ট সদস্য অনারেবল অ্যান্থনি বায়র্ন তাঁর বক্তব্যে বলেন: "সম্মানিত মির্জা মাসরূর আহমদ সাহেব! এটি সত্যিই অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে আপনি আমাদের এই দেশে আমাদের মাঝে এসেছেন এবং আজ আপনাকে স্বাগত জানানো আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। ফেডারেল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে, একজন আধ্যাত্মিক নেতার জন্য এটি একটি কঠিন সময়। বিশেষ করে আপনার জন্য, সম্মানিত মহোদয়, যিনি প্রায় ২০ কোটি অনুসারীর পথপ্রদর্শক, যাদের অনেকেই বিভিন্ন দেশে কেবলমাত্র তাঁদের উচ্চ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণের কারণে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা আপনার জামাআতের সদস্যদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি, যারা এই সমগ্র অঞ্চলে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করছেন। আমরা দোয়া করি যে আপনার এই সফর নিরাপদে সম্পন্ন হোক-শুধু এই সফর নয়, বরং জীবনের প্রতিটি সফরের জন্যই আমরা দোয়া ও শুভকামনা জানাই।"

এরপর ভিক্টোরিয়ার স্টেট পার্লামেন্ট সদস্য মিস ইনগা পিউলিচ তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন:

"সম্মানিত খলীফাতুল মসীহ! আজ আমরা আপনাকে এখানে স্বাগত জানাই। আপনি এমন একটি ধর্মের প্রধান, যা শান্তির বার্তা প্রদান করে। আপনার এই বার্তা এমন একটি বার্তা, যাকে সকল অস্ট্রেলিয়ান সমর্থন করে, কারণ অস্ট্রেলিয়ানরা নিজেরাই বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে আমরা এমন মহান বার্তাকে গ্রহণ করতে চাই এবং আপনার মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে চাই, যারা এ ধরনের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন।"

এরপর মেজর জেনারেল পল ম্যাক ল্যাকলাম, সিনিয়র মিলিটারি অফিসার ডিএমও, যিনি চিফ অব আর্মি স্টাফের প্রতিনিধিত্বে এসেছিলেন, তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন: "মহামান্য, আমি চিফ অব আর্মি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেভিড মরিসনের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার জনগণকে অত্যাচার, আগ্রাসন ও চরমপন্থা থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান আর্মি একটি সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। সরকার পক্ষ থেকে আমরা জনগণকে এমন বড় বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি, যখন অন্যান্য সরকারি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু মহামান্য, আপনি এবং

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

আহমদিয়া জামাআত যে বার্তা উপস্থাপন করছেন, বাস্তবে সেটিই এমন পরিস্থিতিতে প্রথম প্রতিরক্ষার উপায়। আপনার শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বার্তা, সহনশীলতার চেতনা এবং সমগ্র সমাজের প্রতি সমান ভালোবাসার দর্শন সমাজে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করার মৌলিক মাধ্যম।

আপনি আহমদীয়া শিক্ষার এই গুণাবলি শক্তি বা ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়, বরং একটি উত্তম ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্থাপন করে উপস্থাপন করেন।

আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি যে আপনি ত্যাগ ও বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিশ্বজুড়ে শান্তি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এই বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনি আমাদের দেশে এসেছেন এবং আজকের আপনার বক্তব্য শোনার জন্য আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।"

সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন:

মেলবোর্নে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীযের ভাষণ

"সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তাআলার শান্তি, রহমত ও বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত জরুরি ও উদ্বেগজনক বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে, এই উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধর্ম ও বিশ্বাসের পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে আপনাদের অংশগ্রহণ আপনাদের উদারতা ও সহনশীলতার প্রমাণ। বিশেষত বর্তমানের বস্তুবাদী পৃথিবীতে, আপনাদের এখানে একজন ধর্মীয় নেতার কথা শোনার জন্য আগমন আপনাদের উদার ও আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গির একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

যেমন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব যে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তেমনি এর চেয়েও বড় বিষয় হলো আপনাদের ধন্যবাদ জানানো আমার জন্য একটি ধর্মীয় কর্তব্যও। কারণ আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এটিও জরুরি যে আমি অন্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কেননা আমার মহান উপকারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ তাআলার প্রতিও প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এজন্য আল্লাহ তাআলা চান যে মানুষ একে অপরের সাথে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করুক। এ কারণেই পবিত্র কুরআন, যা সকল মুসলমানের জন্য একটি পবিত্র গ্রন্থ এবং আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী শরীয়তের সর্বশেষ গ্রন্থ, এমন সব নির্দেশনায় পরিপূর্ণ যা মানবজাতিকে একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলে। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যক্তির যথাযথ মূল্যায়ন করাও মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতার এই প্রকাশ কেবল আনুষ্ঠানিক নয়; বরং এটি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। অতএব আমি আশা করি, কৃতজ্ঞতার এই আন্তরিক প্রকাশ কেবল উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ পূরণের জন্যই নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি আজকের বিশ্বের কিছু উদ্বেগজনক বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাই, যা মানুষকে মানবাধিকারের দায়িত্ব পালনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে বিশ্বের উদ্বেগজনক অবস্থা সবার কাছেই স্পষ্ট। কয়েক বছর আগে যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল তা বিশ্বের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর প্রভাব এখনও অব্যাহত রয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ও ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি বিশ্বকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং কিছু দেশে বেকারত্ব রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইউরোপের কিছু দেশ ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং কিছু দেশ তো দেউলিয়াও হয়ে গেছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "এটি শুধু ইউরোপের সমস্যা নয়। যদি আমরা আমেরিকার দিকে তাকাই, যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, তাহলে দেখা যায় যে সেখানেও কিছু সিটি কাউন্সিল তাদের শহরগুলোকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝার নিচে চাপা পড়ে গেছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "এটি উন্নত দেশগুলোর অবস্থা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা তো সবসময়ই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও এই বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের প্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে। বলা হয় যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমান বৈশ্বিক যুগে পৃথিবী এমনভাবে একত্রিত হয়ে গেছে যা আগে কখনও হয়নি। এর ফলে একটি দেশের সমস্যার প্রভাব সরাসরি অন্যান্য জাতির ওপরও পড়ে। এই বিষয়টি মাথায় রাখলে আমরা বলতে পারি না যে কোনো দেশ সব ধরনের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে কিংবা বৈশ্বিক ঋণ সংকট থেকে নিরাপদ আছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আমি যে সমস্যার কথা বলছি তা বিশেষভাবে আরব বিশ্ব ও মুসলিম দেশগুলোকে প্রভাবিত করেছে এবং এখন এটি 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত। বহু দেশে সাধারণ জনগণ তাদের শাসক ও সরকারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিশাল জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রক্তপাত ঘটেছিল, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল এবং আজও হাজার হাজার প্রাণ অবিরত ঝরে যাচ্ছে। কিছু দেশে শাসকগোষ্ঠী বিক্ষোভ দমন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু অন্য কিছু দেশে শাসকদের অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আজও এমন কিছু দেশ রয়েছে যা যুদ্ধের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবুও সেসব দেশের সরকারকে বড় বড় বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "বড় বড় শক্তিগুলোও জনগণকে সাহায্য করার নামে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের তাদের এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত, কারণ বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার পরিস্থিতি ঐসব জাতিকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ প্রসঙ্গে যদি আমরা শুধু লিবিয়ার উদাহরণই দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে বর্তমানে শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং গণমাধ্যম সবাই একমত যে সেখানে উপজাতীয় সরকার গড়ে উঠেছে। এর ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আমার সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের সময় একটি সুপরিচিত পত্রিকার একজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এসব দেশে চলমান কার্যক্রমের ফলে ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রভাব ও উপকার সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি। আমি উত্তরে বলেছিলাম যে এই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে লিবিয়ায় শান্তি আসবে না, মিসরেও না, এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "এই বছরের মে মাসে যখন সেই নারী সাংবাদিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন আমি তাকে বলেছিলাম যে মিসরে রক্তপাত ঘটতে যাচ্ছে– এটি খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তবে আমি আশা করিনি যে এটি এত দ্রুত ঘটবে। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই আমরা সবাই দেখলাম কী ঘটেছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "এত ব্যাপক নির্যাতন এবং বিপুলসংখ্যক মানবজীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরও এটি স্পষ্ট ছিল যে এ সময়ে বড় শক্তিগুলো সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের কিছু অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত দমনমূলক শক্তিকে উপেক্ষা করেছে। হয়তো মনে করা হয়েছিল যে এমন লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তার চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করেও একই ফলাফল অর্জন করা সম্ভব ছিল। যাই হোক, আমি যা বলতে চাই তা হলো– একই ধরনের পরিস্থিতিতে বড় শক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আরেকটি দেশের উদাহরণ নেওয়া যাক। আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের চোখের সামনেই সিরিয়ার পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে এবং এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মনে হচ্ছিল যে কিছু বিদেশি দেশ সিরিয়ার ওপর সামরিক হামলার প্রস্তুতির জন্য জোট গঠন করছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠী হয়তো তাদের জনগণের ওপর বড় ধরনের ??? করেছে এবং তাদের সঙ্গে চরম অবিচার করেছে, কিন্তু বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব ধরনের নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে। সরকারবিরোধী বিদ্রোহীরা এমনকি নিরীহ মানুষদেরও নির্মমভাবে হত্যা করছে, যাদের ধর্ম বা বিশ্বাস সিরিয়ার শাসকদের মতোই। তদুপরি, সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করার নামে বাইরের কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীও এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এরা মানবিক সহানুভূতির কারণে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে না; বরং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "সিরিয়ার সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা কোনো রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেনি; বরং তাদের দাবি হলো বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো এসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে। বাইরের সংস্থা ও পরিদর্শকরা বলেছেন যে তাদের কাছে এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কে এই অস্ত্র ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। তবে বর্তমানে সিরিয়ায় এমন সংস্থাগুলো উপস্থিত রয়েছে যাদের দায়িত্ব হলো এই অস্ত্রগুলো ধ্বংস ও নির্মূল করা। আমরা শুধু দোয়া করতে পারি যে আল্লাহ তাআলা তাদের সফলতা দান করুন। প্রকৃত সত্য কী, তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি শুধু ওই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকেই ধ্বংস করেনি, বরং এখন তা সমগ্র বিশ্বের শান্তিকেও ধ্বংস করছে।"

মুসলিম ঐক্যের চাবিকাঠি

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

আমার আজকের বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল 'মুসলিম ঐক্য'। এই (বিষয়বস্তুর) কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে। এর একটি মর্ম এটিও হতে পারে, মুসলমানদের ঐক্য কোন্ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এটির এ-ও অর্থ হতে পারে যে, মুসলমানদের ঐক্য কোন কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অর্থাৎ এক প্রেক্ষাপটে উক্ত বিষয়বস্তুর এই তাৎপর্য গ্রহণ করা হবে, বক্তা এটি স্বীকার করেন, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি শুধু এই ঐক্যের অবস্থা বর্ণনা করতে ইচ্ছুক।

দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর এই তাৎপর্য হবে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের অভাব রয়েছে আর আমাদের তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কোন মাধ্যম অবলম্বন করা উচিত। আমি মনে করি, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামী বিশ্ব নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা প্রত্যেক গোষ্ঠি, যারা মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, দেখেছেন এবং পর্যালোচনা করেছেন তারা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন, মুসলমানদের মাঝে কোন না কোনভাবে ঐক্যের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা বর্তমান যুগে মুসলমানরা ঐক্যের সেই ভিত্তিগুলো থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে যা দৃঢ় ও মজবুত অট্টালিকার জন্য আবশ্যক। আর যাহোক, মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণকারী, মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের রীতিনীতিগুলোর প্রতি সামান্যতম ভালোবাসা রাখে তবে সে অবশ্যই এটি লক্ষ্য করে যে, তার পিতৃপুরুষ কারা ছিলেন, ইসলাম কোথা থেকে এসেছে, ইসলাম কোন ভিত্তি থেকে উঠেছে আর কীভাবে পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে? এটি স্পষ্ট বিষয় যে, মহানবী (সা.) না সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেছেন আর না সিন্ধুতে এসেছেন। মহানবী (সা.) না ভারতবর্ষে জন্মেছেন আর না ভারতবর্ষে এসেছেন। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরাও না সিন্ধুতে জন্মেছেন আর না এখানে এসেছেন। এতে কোন সন্দেহ নাই, কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা এখানে এসেছিলেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। যাহোক, এক বা দু'জন সাহাবীর এখানে আসা যদি প্রমাণিতও হয় তাহলে এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়।

আবার এটিও প্রমাণিত নয় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে সিন্ধুর মানুষ মক্কা বা মদীনাতে গিয়েছিল, তাঁর (সা.) বৈঠকে বসেছিল আর তারা মহানবী (সা.)-এর কথাবার্তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি ইসলাম এখানে এসেছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ তা গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টি প্রমাণ বহন করে, ইসলামের ওপর কোন এক সময় উজ্জ্বল যুগ এসেছে, এর ওপর বিজয়ের যুগও এসেছে, এটি সম্মানের সাথে এখানে এসেছে। এরপর সিন্ধু থেকে বেরিয়ে ইউপি, সিপি, বিহার এবং বাংলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এরপর চীন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এরপর উত্তরের সীমান্ত থেকে বুখারা, চীনী, তুর্কিস্তান এবং ককেশিয়া থেকে বের হয়ে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পোল্যাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মুসলমানদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। মোটকথা ইসলাম- যা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে- এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সকল ব্যক্তি অবগত।

কিন্তু আজ এই শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন কোথায় পাওয়া যায়? আল্লাহ! আল্লাহ! করে এতটুকু লাভ হয়েছে যে, কতক ইসলামী এলাকা স্বাধীনতার শ্বাস গ্রহণ করছে। তবে এই স্বাধীনতা রাজনৈতিকভাবে লাভ হয়েছে, নতুবা মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী এলাকাসমূহ এখনও বহু দূরে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বড়োত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব আর পরাক্রমশালীর অর্থ হল, যদি কোন দেশ কোন এলাকায় আক্রমণ করে তবে সেই এলাকার বাসিন্দারা এই দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখবে যে, বাহ্যিক উপকরণাদি হোক বা চারিত্রিক উৎকর্ষতার দিক থেকেই হোক, তারা শত্রুকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম। শত্রুকে কেবল নিজেদের সীমান্ত থেকে বেরই করে দিবে না বরং স্বয়ং তাদের সীমান্তে গিয়ে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিবে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন ইসলামী দেশ নাই যারা শত্রুর সীমান্তে গিয়ে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা অপর কোন দেশের সাহায্য ছাড়া নিজেদের সুরক্ষা করতে পারে। প্রত্যেক ইসলামী দেশ নিজেদের সুরক্ষার জন্য আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বা অপর কোন ইউরোপীয়ান শক্তির সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়।

একটিও এমন ইসলামী দেশ নাই যারা সমরাস্ত্র তৈরি করে। সমরাস্ত্রের অর্থ এটি নয় যে, তারা রাইফেল মেরামত করছে অথবা রাইফেল বানিয়েছে। বর্তমান যুগে রাইফেলের কোন মূল্যই নাই। সমরাস্ত্র মানে হল, বড়ো বড়ো কামান, এ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, ডেস্ট্রয়ার, ডুবোজাহাজ, যুদ্ধবিমান, ক্রুজ প্রভৃতি। এই সমরাস্ত্রগুলো কোন ইসলামী দেশে তৈরি করা হয় না। বরং যদি বিবাদ হয় তবে এই কথার ওপর বিবাদ হয় যে, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড আমাদেরকে সমরাস্ত্র দেয় না। এর আরেকটি অর্থ হল আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নই। হ্যাঁ, তোমরা যদি আমাদের সাহায্য করো তবে আমরা আমাদের সুরক্ষা করতে পারব। যাইহোক, আজ পর্যন্ত যা কিছু লাভ হয়েছে এজন্য আমরা খোদা তা'লার যতটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা অপ্রতুল হবে। খোদা তা'লা কুরআন মজীদে বলেন,

যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তবে আমি তোমাদের প্রতি আরও বেশি অনুগ্রহ করব। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল, আমরা যা কিছু লাভ করেছি এজন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এছাড়াও আমাদের কর্তব্য হল, আমরা যেন অনুভব করি, আমরা এখনো সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি নাই যা অর্জন করা ব্যতীত আমরা না বীরত্ব ও সাহসীকতার সাথে বসবাস করতে পারব এবং না কোন দেশকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব।

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান যুগে রাশিয়ার শক্তি আছে, আমেরিকার শক্তি আছে, ইংল্যাণ্ডের শক্তি আছে। এরপর আরও ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানের শক্তি আছে। উপনিবেশগুলোর মাঝে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার শক্তি আছে। জাপানও মাথা উঁচু করছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ, যুদ্ধোপকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানা প্রভৃতির দিক দিয়ে কোন ইসলামী দেশ বা ইসলামী দেশসমূহের সংগঠন এমন আছে কি যাকে আমরা এই শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করতে পারব? এমন কোন ইসলামী দেশ আছে কি যে এ কথা বলতে পারবে, এই দেশগুলোর কাছে যদি এতগুলো কামান থাকে তবে আমার কাছেও এতগুলো কামান আছে, তাদের কাছে যদি গোলাবারুদ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও গোলাবারুদ আছে, তাদের কাছে যদি যুদ্ধোপকরণ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও যুদ্ধোপকরণ আছে, তাদের কাছে যদি শিল্প-কারখানা থাকে তবে আমার কাছেও শিল্প-কারখানা আছে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি বিস্তৃত হয়ে থাকে তবে আমার ব্যবসা-বাণিজ্যও বিস্তৃত। মুসলমানদের শক্তিমত্তা সেই রাষ্ট্রসমূহের বিপরীতে ময়দায় লবনের উপস্থিতির মতোও না। অতএব মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক যে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে।

'ইত্তেহাদ' (ঐক্য) আরবী শব্দ। এটি 'ওয়াহদাত' থেকে নির্গত, যার অর্থ ঐক্য বা একতা অবলম্বন করা। এই শব্দটি স্পষ্ট করছে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সংকল্প করেছে, তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতা খুঁইয়ে ঐক্য ও একতা অবলম্বন করবে। আরবী ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি মর্মার্থকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, একটি শব্দের মাঝে সকল প্রকার দর্শন পরিস্ফুটিত হয়। 'ইত্তেহাদ' শব্দটি উর্দূ ভাষায় প্রবেশ করে নিজের মূল অর্থ খুঁইয়ে বসেছে। কিন্তু আরবী ভাষায় এই শব্দ যখন ব্যবহার করা হয় তখন এর দর্শন সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, বক্তা কয়েকটি বিষয় সমর্থন করে। সে স্বীকার করে, ইসলামে অনেক দল-উপদল আছে এবং তারা সকলেই স্বতন্ত্র। আবার এই দলগুলো কতক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে ইচ্ছা ও সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

অতএব এক ব্যক্তি যখন একথা বলবে যে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য হওয়া উচিত, তাহলে সে স্বীকার করে, মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ এবং জনসাধারণের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে। আর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমরা এই দল-উপদলগুলো এবং জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করব। যেন ইত্তেহাদ-এর অর্থ হল, সংস্কৃতির ভিত্তি রাখা। সভ্যতারও একই অর্থ। সভ্যতার অর্থ হল, একত্রে বসবাস করা এবং কতক বিধিনিষেধ নিজের ওপর আরোপ করে নেওয়া। আমরা যদি বলি, মানুষ সভ্য স্বভাব বিশিষ্ট তাহলে এর অর্থ হল, কুকুর, শুকর এবং বিড়ালের মাঝে এই শক্তি বা ক্ষমতা নাই যে, এগুলো নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে পরিত্যাগ করে জাতীয়স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে, কিন্তু মানুষের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বা গুণ পাওয়া যায় যে, তারা অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে থাকে। আর এই বিষয়টিই 'ইত্তেহাদ' তথা ঐক্য হয়ে থাকে। সকল বিষয়ে 'ইত্তেহাদ' বা ঐক্য অসম্ভব। ঐক্য শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে হতে পারে আর কিছু বিষয়ে হবে না। না প্রত্যেক বিষয়ে ঐক্য হতে পারে আর না প্রত্যেক বিষয়ে ঐক্য হওয়া ফলপ্রসূ হবে। অতএব এই প্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন হল, সকল ক্ষেত্রে কি ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব? সকল মতবিরোধ দূর করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পরেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব যে, আমরা দাবি করছি, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। আর আমরা যদি ঐক্য সৃষ্টি করতে পারি তবে কোন নীতির ভিত্তিতে আমরা সৃষ্টি করতে পারব আর কোন নীতির ভিত্তিতে (ঐক্য) করতে পারব না।

সর্বপ্রথমে আমাদের সেই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা উচিত যার কারণে মানুষ বিভক্ত হয়। আর আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই বিষয়টিও দেখতে হবে যে, কোন কোন শক্তিকে আমাদের পরাভূত করতে হবে এবং সেই শক্তিসমূহকে দূর করার ফলে আমাদের কোন শক্তি অর্জিত হবে।

কোন জাতির প্রাকৃতিক মৌলিক বৈসাদৃশ্যগুলো হল, প্রথমত: নারী-পুরুষের বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্য সব জায়গাতেই আছে। নারী-পুরুষের কাজ ভিন্ন ভিন্ন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 21 May 2026 Issue No.21

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হয়ে থাকে। নারী–পুরুষের বৈশিষ্ট্যও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সন্তান জন্মদান নারীর স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে আর পুরুষের স্কন্ধে জীবনের প্রয়োজন নিবারণ। সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত এবং পুরুষের ওপর বাহির সামলানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। মোটকথা নারী–পুরুষের শক্তি ও সামর্থ্য আলাদা। এগুলোর মাঝে ঐক্য হওয়া সম্ভব নয়। আর এই বিষয়টি যদি সম্ভবও হতো যে, এই বৈসাদৃশ্য দূর করা যেত তাহলে মানুষ তা কখনও পছন্দ করত না। এই বৈসাদৃশ্য দূর করা আত্মহননের নামান্তর হবে। নারী–পুরুষের মাঝে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলবৎ থাকবে। খোদা তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন, আমরা তোমাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছি যে, আমরা নরনারী সৃষ্টি করেছি। এই উভয়ের মাধ্যমে আমরা মানবধারা সূচিত করেছি যেন মানুষ পুণ্য ও খোদাভীতি অবলম্বন করে আর এরপর আমরা তাদের মাঝে স্বীয় গুণাবলি সৃষ্টি করেছি।

এরপর দৈহিক আকৃতি ও গঠনের পার্থক্য রয়েছে। কতক দেশের মানুষ দীর্ঘাকৃতির হয়ে থাকে আর কতক দেশে খর্বাকৃতির মানুষ পাওয়া যায়। এরপর শারীরিক স্বাস্থ্যের পার্থক্য রয়েছে। কেউ শীর্ণকায় হয়ে থাকে আবার কেউ স্থূলকায় হয়ে থাকে। এরপর গায়ের রং ও উজ্জ্বলতার পার্থক্য রয়েছে। কেউ বাদামী রঙের, কেউ বা গৌর বর্ণের। কেউ বা পীত বর্ণের আর কেউ লালচে বর্ণের। আফ্রিকানদের মাঝে যাও– সেখানে কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ দেখতে পাবে। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা গোধুম বর্ণের হয়ে থাকে। চীনারা পীত বর্ণের হয় আর আরবে উট পাখির ডিমের রঙের অনুরূপ বর্ণের লোক পাওয়া যায়। ইউরোপে গৌর বর্ণের মানুষ পাওয়া যায়।

এরপর মুখায়বেরও ভিন্নতা রয়েছে। কারও চিবুক ঝুলে থাকে, কারও উঁচু থাকে। কারও দাড়ি কম হয় আর কারও দাড়ি বেশি। আবার কেউ সুঠাম দেহের অধিকারী হয় আর কেউ ছিপছিপে গড়নবিশিষ্ট। এরপর বল বা শক্তিমত্তার মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। কেউ বেশি শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে আর কেউ কম শক্তির। আবার সুন্দর ও অসুন্দরের মাঝেও পার্থক্য আছে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝেও পার্থক্য আছে। কারও মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেশি থাকে এবং কারও মাঝে কম। কারও স্মরণশক্তি প্রখর হয় আর কারও কম। আবার পঞ্চইন্দ্রিয়ের পার্থক্য রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখি, ডাক্তার চশমার পরামর্শ দিলে কাউকে ১ শক্তির চশমা নির্দেশ করেন আবার কাউকে ২ শক্তির চশমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কাউকে দূরদৃষ্টির চশমা প্রদান করেন আবার কাউকে নিকটদৃষ্টির চশমা প্রদান করেন। এরপর স্বাদের মাঝেও পার্থক্য আছে। কতিপয় মানুষ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম স্বাদও আস্বাদন করতে পারে। ইংরেজদের মাঝে এই গুণটি আধিক্যের সাথে পাওয়া যায়। সেখানে স্বাদের অনুশীলন করা হয়। মদের প্রচলন সেখানে স্বাভাবিক বিষয়। তারা এমন লোককে– যে এটি বলতে পারে যে, এই মদ কোন বছরের আঙ্গুর দিয়ে তৈরি তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করে। ইসলামে যেহেতু মধ্যপন্থা অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই মুসলমানদের মাঝে এতটা বাড়াবাড়ি নাই যে, তারা খাদ্যপানীয়র বস্তুর জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিবে। কিন্তু ইউরোপে খাদ্যপানীয়র বস্তুর জন্য হাজার হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ঘ্রাণশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ঘ্রাণের ভিন্নতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। তারপর কণ্ঠস্বরের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান। কারও গলা দিয়ে স্বর বের হয়, কারও নাক দিয়ে। কেউ কেউ এতো কর্কশ গলায় কথা বলে যে, নমনীয়তার লেশ মাত্র নাই। কেউ আবার এতো ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলে যে, তার মাঝে ছন্দ ও হৃদয়োত্তাপ পাওয়া যায়। তারপর বোঝা বহনের এবং আন্দাজ বা অনুমান করার ক্ষমতার মাঝেও ভিন্নতা আছে। কেউ এক মন বোঝা বহন করতে পারে, কেউ দুই মন বোঝা বহন করতে পারে। এরপর ওজন ও দূরত্বের আন্দাজ বা অনুমান করার মাঝেও ভিন্নতা আছে। একজন সৈনিক খালি চোখে দেখেই বলতে পারে যে, এই দূরত্বের ব্যবধান এক ফিট নাকি দুই ফিট। পরিমাপ যন্ত্র তো সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে। পূর্বে অফিসারদেরকে দূরত্ব অনুমান করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। শুধুমাত্র খালি চোখে দেখেই অনুমান করে সৈনিকরা কাজ করত। অফিসাররা চোখে দেখেই অনুমান করে বলতে পারত, এখন কত দূরত্বে গোলা ছোড়া আবশ্যক এবং কামান কত দূরত্বে গোলা নিক্ষেপ করছিল। পূর্বের যুগে শুধুমাত্র চোখের চাহনির মাধ্যমে দূরত্বের অনুমান করার অভিজ্ঞতার গুণে বড়ো বড়ো যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় মানুষের এই বিষয়ে কোন ধারণাই থাকে না যে, চোখের মাধ্যমে কীভাবে অনুমান করা যায়। অযথাই ভারসাম্যহীন কথা বলে দেয়।

একটি কৌতুক প্রচলিত আছে যে, এক রাজার দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয়।পণ্ডিতরা বলে, এই পাপ মোচন হবে না। হ্যাঁ, অমুক ধরনের ব্রাহ্মণকে এত পরিমাণ দান করুন তবে এর প্রভাব দূর হতে পারে। রাজা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, কেননা যে ধরনের ব্রা হ্মণ সন্ধান করা হচ্ছিল সেই ধরনের ব্রাহ্মণ এই এলাকায় ছিল না। বাদশাহ্ উজিরদেরকে আদেশ দেন, তারা যেন সেই ধরনের ব্রা হ্মণের সন্ধান করেন। অতঃপর একজন উজির বলে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি এই ধরনের ব্রা হ্মণের সন্ধান করব। বাদশাহ তাকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর সে পথে দাঁড়িয়ে যায় যেন পথিকদের পরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে পারে যে, তাদের মাঝে ব্রাহ্মণ কে? প্রজারা যখন জানতে পারে বাদশাহ এক ব্রা হ্মণের খোঁজে আছেন কিন্তু তার সন্ধান লাভ হচ্ছে না তখন তারা মিথ্যা বলা আরম্ভ করে আর নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করে। যে শুদ্র সেও নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দেয়, যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা অন্য কোন জাতের সেও নিজেকে ব্রা হ্মণ বলে পরিচয় দেয়, যেন সে যেকোনোভাবে দান লাভ করতে পারে। সেই উজির পথের ওপর দাঁড়িয়ে পথিকদের পরীক্ষা করছিল ইতোমধ্যে দুইজন ব্যক্তি ঐ পথ অতিক্রম করছিল। উজির ভাবল, হতে পারে উভয়ের মাঝে একজন ব্রাহ্মণ হবে। অতএব সে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের মধ্যে কি কেউ ব্রাহ্মণ? তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে বেনিয়া ছিল– সে বলে, আমি ব্রাহ্মণ। অপর ব্যক্তি– যে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ ছিল, বলে, আমি ব্রা হ্মণ। উজির আদেশ দেয়, তাদের উভয়কে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাদের জবানবন্দী নেওয়া হবে। সে বেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, গাছ কত উঁচু হয়? বেনিয়া বলে, গাছ ৪৪–৪৫ ফুট উঁচু হয়। তারপর সে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে বলে, তুমি বলো, গাছ কত উঁচু হয়? সে বলে, গাছ ৪–৫ ফুট উঁচু হয়। অতঃপর উজির বলে, এ হল ব্রাহ্মণ। যেহেতু এর বিনা পরিশ্রমে খেয়ে অভ্যস্ত আর নিষ্কর্মা থাকে তাই এরা নিজেদের বিবেক–বুদ্ধি খাটায় না, শুধুমাত্র লোকমুখে শোনা কথায় বিশ্বাস করে। যাইহোক উজির সেই ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে চিনে ফেলে এবং বলে, এই ব্যক্তিই ব্রা হ্মণ, তাকে দান দিয়ে দাও।

(আনোয়ারুল উলূম, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃ. ৬২৯–৬৫৯)... (চলবে)

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir